তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ

শারীয়াহ দ্বারা শাসনের আবশ্যকতা সম্পর্কে অতীত ও বর্তমানের 'উলামাগনের বক্তব্যের সংকলন এবং এ বিষয়ে সৃষ্ট বিভ্রান্তিসমূহের অপনোদন

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্   -র যিনি আল-‘আফুয়্যু, আত-তাওয়্যাবু, আল-ওয়াহহাব, আশ-শাকুর - যিনি সমগ্র সৃষ্টির অধিপতি, সমস্ত কিছুর মালিক, মহিমান্বিত, গৌরবান্বিত, পরিপূর্ণ সম্মানের অধিকারী - যিনি সর্বশক্তিমান, প্রবল পরাক্রমশালী, অপ্রতিরোধ্য, প্রতাপান্বিত, সমুন্নত, আল-হাকাম, আল-হাকিম পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু – যিনি আল-আহাদ, আল-ওয়াহিদ, যিনি আল-‘আলা, আল-‘আলিয়্যু, যিনি সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ, যার কোন শরীক নেই, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন সাদৃশ্য নেই, কোন কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়, আমরা তাঁর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাবো এবং তাঁর ইচ্ছে ব্যাতীত কোন গতি, নিরাপত্তা, আশ্রয় নেই, নেই কোন শক্তি, সক্ষমতা কিংবা সামর্থ্য।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা আল নাবীউর মারহামা, আল নাবীউল মালহামা, আদ্ব-দ্বাহুক আল-ক্বাত্তাল, আল ইমামুল মুজাহিদীন, রাহমাতুললীল আলামীন মুহাম্মাদ এর উপর, তার পরিবার এবং তার সাহাবাদের উপর।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্   ব্যাতীত কোন ইলাহ নেই, তার কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, হুকুমাত তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান, তাঁর ইচ্ছা ব্যাতীত কোন শক্তি, সামর্থ্য, আশ্রয় নেই, এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর গোলাম এবং রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মহান আল্লাহ্   সত্য, তাঁর নাবী ﷺ সত্য, এবং তাঁর মনোনীত দ্বীন ইসলাম সত্য। নিশ্চয় আমার সালাত, আমার ক্বুরবানী, এবং জীবন ও মৃত্যু জগত সমূহের একমাত্র অধিপতি আল্লাহ্   ‘আযযা ওয়া জালের জন্যই। আমিও আরও সাক্ষী দিচ্ছি, নিশ্চয় আল্লাহ্   হলেন সার্বভোম ক্ষমতার অধিকারী আর এ ব্যাপারে তাঁর কোন শরীক নেই, নিশ্চয় তিনি হলেন বিধানদাতা এবং তাঁর বিধান ছাড়া আর কোন বিধানের বৈধতা নেই, এবং নিশ্চয় দ্বীন ইসলাম একমাত্র সত্য জীবনবিধান, যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া আর কোন দ্বীন গ্রহণ করবে কোনদিনই তা তার পক্ষে থেকে কবুল করা হবে না। সে ক্ষতিগ্রস্থ দুনিয়াতে এবং আখিরাতে।

আল্লাহ্   ‘আযযা ওয়া জাল তাঁর কিতাবে আমাদের জানিয়েছেন -

সুতরাং যারা তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে। [আল-বাক্বারাহ, ২৫৬ এবং ২৫৭]

এবং তিনি বলেছেন -

আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক"। [সুরা আন-নাহল, ৩৬]

তিনি আরও বলেছেন –

যারা ঈমানদার তারা ক্বিতাল করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা ক্বিতাল করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা ক্বিতাল করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল। [সূরা আন-নিসা ৭৬]

এবং, আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল আমাদের জানিয়েছেন –

যারা তাগুতের ইবাদাত থেকে বিরত থাকার জন্য তাগুত থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। অতএব, সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে। [আল-যুমার, ১৭]

তিনি সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেছেন –

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ নিবে এবং কিছু অংশকে পরিত্যাগ করবে? যদি তাই কর তবে মনে রেখ- পৃথিবীতে তোমরা হবে চরম লাঞ্চিত,বঞ্চিত এবং আখিরাতে তোমাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

(সূরা বাক্বারা, আয়াত ৮৫)

এবং তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন –

"...অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্যে গ্রহণ করো না, যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।" [সূরা আল-মায়'ইদা]

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের আদেশ করেছেন

"আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয়; এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ র জন্যই হয়ে যায় (অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন ও শাসন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়)..." [আল-আনফাল, ৩৯]

এবং তাঁর রাসূল ﷺ বলেছিলেন-

আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা বলে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সুতরাং যে ব্যাক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্য দিবে তাঁর জান ও মাল-সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের কোনো হক্ ব্যাতীত। আর তাঁর অন্তরের হিসাব আল্লাহ তাআলার উপর ন্যস্ত। [বুখারী, মুসলিম ১/৫২,হাঃ নং-২১। নাসায়ী-৬/৪ হাঃ নং৩০৯০]

তিনি ﷺ আরো বলেছেন –

ইসলামের বন্ধনগুলো একটির পর একটি খুলে আসবে। যখনই একট বন্ধন খুলে আসবে, লোকেরা তার পরেরটিকে আঁকড়ে ধরবে। সর্বপ্রথম যে বন্ধন খুলে যাবে তা হবে শাসন (আল হুকুম), এবং সর্বশেষটি হল সালাত। [মুসনাদের আহমাদ, আল মু'জাম আল-কাবির আত-তাবারানি, সাহিহ ইবন হিব্বান]]

"এমন একটা সময় আসবে যখন ঈমানদারদের জন্য ইমান ধরে রাখা হাতের মুঠোয় জলন্ত কয়লা ধরে রাখার মত কঠিন হবে।"[সুনানে তিরমিযি]

আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিত নির্বাসিতের মত। পুনরায় একদিন তা নির্বাসিতে পরিণত হবে। গুরাবাদের জন্য সু-সংবাদ। [সাহিহ মুসলিম-১৪৬]

নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ সত্য বলেছেন।

বর্তমানে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের যে সময় উম্মাহ পার করছে এরকম ভয়াবহ সময় আর কখনো উম্মাহর ইতিহাসে আসেনি। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বিপর্যয়ের ফলশ্রুতিতে উম্মাহ-র বড় একটা অংশ এখন বিজয়ের স্বপ্ন দেখতেও ভুলে গেছে। পুরো বিশ্বকে পদানত করা, আল্লাহ-র দ্বীন ও শারীয়াহকে পুরো পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার বদলে অনেকেই এখন লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন "কোন মতে টিকে থাকা" আর "খাপ খাইয়ে নেওয়া"- কে। প্রচন্ড দুর্দশা আর দীর্ঘ দিনের পরাজয়ের ফলশ্রুতিতে পরাজিত মানসিকতা তাদের মধ্যে জেঁকে বসেছে। ফলে অপরিবর্তনীয় তাকে পরিবর্তনের, যে বিষয়গুলো নিয়ে আপোষ করা সম্ভব না, সেগুলোর ক্ষেত্রে আপোষের একটি দর্শন উম্মাহ-র একটি অংশের মধ্যে ছড়িয়ে পরেছে। আর আপোষকামীতা ও পরাজিত মানসিকতার এই ব্যাধির অনেক উপসর্গের মধ্যে একটি হল শারীয়াহ দিয়ে শাসনের আবশ্যকতা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। কিন্তু এটি কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য না।

অনেক আয়াত, হাদীস, সালাফদের বক্তব্য এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর ইমামগণ এবং উলেমাগণের বক্তব্য থেকে সন্দেহাতীতভাবে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত যে – আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা শাসন করা আবশ্যক; ফরয। শাসনের ও আনুগত্যের ব্যাপারে আল্লাহ আযযা ওয়া জালের সাথে কাউকে শরীক না করা, তাওহীদের ও ঈমানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি দ্বীনের এমন একটি বিষয় যা সংশয়পূর্ণ কিংবা মতবিরোধ পূর্ণ না, বরং সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমরা দেখি আজ অনেকের মধ্যে এ বিষয় নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

এটি এমন একটি ফিতনা যা বহিঃশত্রুর আগ্রাসনের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর। বিশেষ করে যখন উম্মাহর আরেকটি অংশ উম্মাহর বিজয়ের জন্য, উম্মাহর মর্যাদা, গর্ব ও সম্মানের দিনগুলো ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করছে – এবং আল্লাহ-র ইচ্ছায় আমাদের ও আল্লাহ-র শত্রুদের বিরুদ্ধে তারা বিজয়ী হচ্ছে। এরকম একটি সময়ে পরাজিত মানসিকতার এবং অসম্মান ও অপমানের এই

ফিকহের মোকাবেলায় সম্মান, মর্যাদা এবং শক্তির ফিকহকে উপস্থাপন করা, এবং তার প্রতি আহবান করা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। এ কারণে দাওয়াহর ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো সর্বাধিক গুরুত্ব পাবার দাবি রাখে তার মধ্যে তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ অন্যতম। কারণ তাওহীদের সাথে আপোষ করে, আল্লাহ-র একত্বের সাথে আপোষ করে যে ইসলামের দাওয়াহ দেওয়া হয়, সেটা কখনো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর ﷺ আনীত ইসলাম না। পরিপূর্ণ তাওহীদের দাওয়াহ দেওয়ার জন্য আমরা আল্লাহ 'আযযা ওয়া জালের কাছে দায়বদ্ধ, বিশ্বজগতের একচ্ছত্র অধিপতি যা নাযিল করেছেন, আমাদের কোন অধিকার নেই তাতে সংযোজন, বিয়োজন, সম্পাদন কিংবা পরিমার্জন করার। আমরা আদিষ্ট সত্য প্রকাশ করার জন্য। এটা মিল্লাতু ইব্রাহীমের দাবি। "অতএব আপনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না।" [আল হিজর, ৯৪]।

তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহর ব্যাপারে বিদ্যমান বিভিন্ন বিভ্রান্তি দূর করা, শারীয়াহ বক্তব্য, এবং এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর অবস্থান তুলে ধরার মাধ্যমে, দাওয়াতী কাজের সাথে যুক্ত ভাইদের সাহায্য করার জন্য এ প্রচেষ্টা। আল্লাহ্ যেন আমার পক্ষ থেকে এই প্রচেষ্টা কবুল করেন। বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীরা যেসব বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তার দালীলসহ জবাব এবং অতীত ও বর্তমানের হক্বপন্থি 'উলামাদের বক্তব্য খুঁজে পাবার ব্যাপারে, আল্লাহ্ চাইলে এ সংকলনটি উপকারী হবে। আর সাফল্য শুধুমাত্র আল্লাহ-র পক্ষ থেকে। এতে যা কিছু কল্যাণকর আছে তা একমাত্র আল্লাহ্ রই পক্ষ থেকে, আরা যা কিছু ভুল-ভ্রান্তি আছে তা আমার এবং শয়তানের পক্ষ থেকে।

এ সংকলনটি ভাইরা চাইলে নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করতে পারেন এবং প্রচার করতে পারেন। সম্পূর্ণ সংকলনটি অথবা কোন নির্বাচিত অংশ। এক্ষেত্রে এই অধমের নাম উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই। এটি আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ-র সন্তুষ্টি অর্জন, সত্যকে উপস্থাপন এবং সাদাকে যারিয়্যাহর একটি প্রচেষ্টা। একজন ভাই হিসেবে আমার শুধু দুটো অনুরোধ থাকবে। প্রথমত, তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহর বিষয়টিকে দাওয়াহর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া এবং বিষয়টিকে খাটো করে না দেখা। ভাইদের প্রতি দ্বিতীয় অনুরোধ হবে তাদের দু'আতে আমাকে স্মরণ রাখা। অনুরোধ থাকবে তাদের সুজুদে এবং মুনাজাতে আমাকে স্মরণ করার জন্য, এবং আল্লাহ্ আল-ওয়াহহাব আল-ওয়াদুদের কাছে এই দু'আ করার জন্য, তিনি যেন তাঁর এই পাপী গোলাম সে কাফিলাতে শামিল করেন যার নেতা হলেন হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

আল্লাহ্ যেন কবুল করেন আমার পক্ষ থেকে এবং আপনাদের পক্ষ থেকে। আমীন। সুম্মা আমীন।

সূচীপত্র

***

তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ

“আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না।” [সূরা ইউসুফ, ৪০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন –

“নিশ্চয় আল্লাহ্ হচ্ছেন আল-হাকাম (বিচারক), এবং হুকুম (বিধান, আইন প্রণয়ন) হল তাঁর অধিকার।” [আবু দাউদঃ ৪৯৫৫, আন-নাসাঈ ৮/২২৬, আল-আলবানীর মতে সাহীহ্]

“আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের একটি হল হাকিমিয়্যাহ। যখনই কেউ কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য আইন প্রণয়ন করে, তখনই সে নিজেকে আল্লাহর বদলে এমন আরেক প্রভুর ভূমিকাতে বসিয়ে নেয় যার আইনের আনুগত্য ও অনুসরণ করা হয়। আর যারা এই আইন প্রণেতা বা আইন প্রণেতাগণের আনুগত্য করে, তারা আল্লাহ্'র গোলামের পরিবর্তে আইন প্রণেতাদের গোলামে পরিণত হয়। তারা অনুসরণ করে আইন প্রণেতাদের সৃষ্ট দ্বীনের, আল্লাহর দ্বীন ইসলামের না। জেনে রাখুন আমার প্রিয় ভাইরা, এটা আক্বিদার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। এটা হল উলুহিয়্যাহ (একমাত্র আল্লাহ্ কে ইলাহ/উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা) এবং ‘উবুদিয়্যাহর (একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব) প্রশ্ন। এটা হল ঈমান ও কুফরের প্রশ্ন। জাহিলিয়্যাহ এবং ঈমানের প্রশ্ন। জাহিলিয়্যাহ কোন নির্দিষ্ট সময় বা যুগ না, জাহিলিয়্যাহ হল একটি অবস্থা।“ [সাইদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ - ফী যিলাল ইল ক্বুর’আন]

“মুসলিমের আইন (শারীয়াহ) দ্বারা শাসিত প্রতিটি দার (ঘর, ভূমি, অঞ্চল) হল দারুল ইসলাম এবং কুফর আইন দ্বারা শাসিত প্রতিটি দার হল দারুল কুফর, আর এই দুই ধরনের নিবাস ছাড়া আর কোন শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ নেই।“ [আব্দুল্লাহ আল মাক্বদিসি ইবন ক্বুদামা আল হানবালি, আল আদাব উশ-শারীয়াহ ওয়াল মিনাহ লিল-মার’ইয়াহ]

সমগ্র সৃষ্টি জগতের মালিক, আরশের অধিপতি, যিনি আসমানসমূহকে সমুন্নত করেছেন কোন প্রকার খুঁটি ছাড়াই, আল্লাহ্ ‘আযযা ওয়া জাল, তাঁর গোলাম মানবজাতি এবং জ্বিনজাতির উপর আবশ্যক করেছেন সম্পূর্ণভাবে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন, শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর বিশ্বাস স্থাপন, তাঁর ﷺ উপর নাযিলকৃত কিতাব আল-ক্বুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ এবং ইসলামী শারীয়াহর সম্পূর্ণ অনুসরণ। এ ব্যাপারগুলোকে আল্লাহ্ আল-মালিক, আস-সামাদ আমাদের ইচ্ছাধীন করেন নি। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আমাদের উপর এগুলো বাধ্যতামূলক করেছেন। তিনি

এগুলো কোন স্থান-কাল-সম্প্রদায়ের উপর নির্দিষ্ট করেন নি। ক্বিয়ামত পর্যন্ত জিন ও মানবজাতির জন্য এ আদেশগুলো অবশ্য পালনীয়।

ঠিক যেভাবে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের জন্য আল্লাহ্ আল-হাকাম বিভিন্ন বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তেমনি ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যও বিভিন্ন বিধান তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, আমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ এ কথার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে না। যে মহান প্রতিপালক ঘুম থেকে ওঠার পর পুনরায় ঘুমাবার আগ পর্যন্ত ব্যক্তির প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্তের ব্যাপারে, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের ﷺ সুন্নাহর মাধ্যমে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা জানিয়ে দিয়েছেন, যে এক ও অদ্বিতীয় অধিপতি, দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের জন্য উত্তম নিয়ম ঠিক করে দিয়েছেন, তিনি মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালা, অপরাধ ও অপরাধীর শাস্তি, অর্থনৈতিক লেনদেনের নিয়ম, রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার নিয়ম, মুসলিমদের সাথে অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়সমূহের সম্পর্ক কি রকম হবে – এ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমাদের কোন নির্দেশনা দেন নি, এগুলো আমাদের খেয়ালখুশির উপর ছেড়ে দিয়েছেন, এমন কথা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেই গ্রহণযোগ্য না। আর আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের ﷺ সুন্নাহ থেকে এ সত্য সুস্পষ্ট যে ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় – জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নিয়ম ঠিক করে দিয়েছেন। এ সব কিছু নিয়েই দ্বীন ইসলাম। সম্পূর্ণ ও সর্বোত্তম জীবনবিধান। যাতে অবকাশ নেই কোন রকম সংযোজন ও বিয়োজনের। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর কিতাবে বলেছেন –

আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। [আল-মায়'ইদা, ৩]

এ বিষয়গুলো নিয়ে উম্মাহর মধ্যে কক্ষনোই কোন মতবিরোধ, মতপার্থক্য, সন্দেহ ও সংশয় ছিল না। কিন্তু আজ আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি যখন ইসলামের স্বতঃসিদ্ধ, সুপ্রতিষ্ঠিত, সুসাব্যস্ত বিষয়গুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা চলছে এবং উম্মাহর বিশাল একটা অংশ সুস্পষ্ট এসব বিষয় নিয়ে সন্দেহে পরে গেছে। বর্তমানে ইসলামের যেসব অপরিবর্তনীয় বিষয়গুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হল শারীয়াহ দ্বারা শাসনের আবশ্যকতা। ইসলামের বাহ্যিক শত্রু – যায়নিস্ট ইহুদী, ক্রুসেইডার খ্রিষ্টান, উদারনৈতিক পুজিবাদি গণতন্ত্রী, বস্তুবাদী সমাজতন্ত্রী, নাস্তিক ইসলামবিদ্বেষী, সেক্যুলার মানবতাবাদীরা ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আল্লাহ্ 'আযযা ওয়া জালের নাযিলকৃত ও নির্ধারিত শারীয়াহকে বর্বর, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক বিশ্বে অগ্রহণযোগ্য বলে মানুষের কাছে তুলে ধরার। এজন্য তারা ব্যবহার করছে ম্যাস মিডিয়া, পপুলার কালচার, প্রাচ্যবাদী, ওয়েস্টার্ন ইন্টেলেকচুয়াল এস্টাবলিশমেন্ট এবং মুসলিম বিশ্বে তাদের তোতাপাখিদের। ইসলামের বাহ্যিক শত্রুদের এ প্রচেষ্টার ইতিহাস বেশ পুরনো। তবে আধুনিক সময়ে শারীয়াহকে কেন্দ্র করে উম্মাহর ভেতর থেকেই আমরা এমন কিছু বক্তব্য, এবং অবস্থা দেখতে পাচ্ছি যা এতোটা ব্যাপকভাবে উম্মাহর ইতিহাসে এর আগে দেখা যায় নি। আমরা

দেখতে পাচ্ছি উম্মাহর মধ্যে এমন কিছু দা'ঈ ও 'উলামার আবির্ভাব ঘটেছে যারা অপরবর্তনীয়কে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে। আধুনিকতা, অগ্রগতি এবং ক্রমপরিবর্তনশীল সময়ের সাথে তাল মেলানোর অজুহাতে তারা শারীয়াহ দিয়ে শাসনের আবশ্যকতাকে রহিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কেউ এর নাম দিচ্ছে শারীয়াহ সংস্কার (Shariah Reform), কেউ নাম দিচ্ছে শারীয়াহ পুনঃব্যাখ্যা করা (Reinterpreting the Shariah), কেউ একে বলছে আধুনিক সহনশীল ইসলাম (Modern Moderate Islam) আবার কেউ সরাসরি বলছে শারীয়াহ দিয়ে শাসন করার আবশ্যক ছিল একটি নির্দিষ্ট সময় ও অঞ্চলের জন্য, কিন্তু বর্তমানে এই আবশক্যতা আর নেই। পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি, আরেকটি ধারার উদ্ভব ঘটেছে যারা শারীয়াহ ও সালাফদের অনুসরণের চাদরে নিজেদের ঢেকে নিয়ে, শারীয়াহর অপব্যাখ্যার মাধ্যমে শারীয়াহ ছাড়া অপর কিছু দিয়ে শাসন করা শাসকের বৈধতা দিচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা শাসকদের গোলাম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর শারীয়াহ ছাড়া অপর কোন শারীয়াহ দ্বারা শাসনের বৈধতা দিচ্ছেন।

বাংলাদেশেও শারীয়াহ নিয়ে এ দুটি ভ্রান্ত অবস্থানের পক্ষে বেশ প্রচার ও প্রচারণা চলছে। একদিকে শারীয়াহ এবং দ্বীনের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির আমূল ও জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিবর্তনের [Epistemological change regarding the Shariah] কথা বলা হচ্ছে, অন্যদিকে বলা হচ্ছে যেকোন শাসকের আনুগত্য করা শারীয়াহর আবশ্যক বিধান, এবং যারা আনুগত্য করবে না তারা বিদ'আতি, পথভ্রষ্ট ও খাওয়ারিজ। তাই আজ আমরা শুনছি পাবলিকলি প্রচার করা হচ্ছে যে – আল্লাহ্‌ র আইনের বিপরীতে অন্য কোন আইন দিয়ে শাসনকারী এবং সেই শাসকের আইন বাস্তবায়নকারীর সাথে সাধারণ একজন মুসলিমের পার্থক্য নেই। আজ আমরা এমন সব কথা শুনতে পাচ্ছি যেখানে এই মেসেজ দেওয়া হচ্ছে যে আল্লাহর আইনের বদলে অন্য কোন আইন দিয়ে শাসন করা, এমন কোন বড় সমস্যা না। আমরা দেখছি প্রচার করা হচ্ছে, শারীয়াহ দিয়ে তখনই শাসন করা হবে যখন অধিকাংশ জনগণ তা চাইবে, তার আগ পর্যন্ত শাসকের আনুগত্য করতে হবে। কেউ বলছেন শারীয়াহ দিয়ে শাসন না করেও ইসলাম পালন সম্ভব, কেউ বলছেন মানবরচিত আইন দিয়ে শাসন করা, এমন কোন বড় ব্যাপার না, আমাদের এ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বরং ব্যক্তিগতভাবে ঈমানের বিশুদ্ধতা অর্জন, 'আমল ঠিক করতে হবে, আরবি ভাষা শেখা, সঠিক উচ্চারনে ক্বুর'আন পড়তে শেখা, ফজরের সালাত জামাতে আদায় করা, সঠিক আক্বীদা শেখা ইত্যাদি বিষয়ে মনোনিবেশ করা উচিৎ। এবং এ কথাগুলো কোন সেক্যুলারিস্ট, কোন লিবারেল গণতন্ত্রী, কোন অ্যাগনস্টিক, কোন নাস্তিক, কোন কমিউনিস্ট বলছে না, এটা বলছে এমন লোকজন যারা নিজেদের আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের দ্বীনের দা'ঈ বলে পরিচয় দেন। এ কথাগুলো বলা হচ্ছে না হলুদ মিডিয়ার টকশো, সংসদ ভবদ কিংবা শাহবাগীদের মঞ্চ থেকে, বরং এরকম কথা বলা হচ্ছে মিম্বার থেকে!

লা হাওলা ওয়ালা ক্বু'আতা ইল্লাহ বিল্লাহ।

নিশ্চয় এসব অবস্থান বাতিল। আল্লাহর দ্বীন অপরিবর্তনীয়, তাঁর শারীয়াহ অপরিবর্তনীয়। দ্বীন ইসলামের কোন আলাদা আলাদা সংস্করণ নেই। একটি ইসলাম রয়েছে যা প্রচার করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং যা সঠিকভাবে পালন করেছেন আস-সালাফ আস-

সালেহীন আর এর বাইরে যা আছে তা বাতিল, গোমরাহী, জাহেলিয়্যাহ। আল্লাহ্‌ রাসূল ﷺ যে শারীয়াহ এনেছেন, তা দ্বারা শাসন করা, বিচার করা ঈমানের আবশ্যক শর্ত ও তাওহীদে বিশ্বাসী হবার আবশ্যক শর্ত, এবং শারীয়াহ দ্বারা শাসনের বিধান এবং শারীয়াহতে পরিবর্তনের কোন অধিকার কারো নেই। শাসন আল্লাহর আইন দ্বারাই হতে হবে, এটি "লা ইলাহা ইল্লালাহ" – তে বিশ্বাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শাসন চলবে শুধুমাত্র আল্লাহর আইনে, এই বিশ্বাস ছাড়া তাওহীদ, অর্থাৎ আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাস, অসম্পূর্ণ। আর এই বিশ্বাসের নাম হল তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ। সারাজীবন মাজারপূজা, পীরপূজা, ব্যক্তিপূজা, নফসের পূজার বিরোধিতা করা ব্যক্তি, সারা রাত তাহাজ্জুদে কাটিয়ে দেয়া আর সারা বছর রোযা রাখা ব্যক্তিও যদি তাওহীদুল হাক্যিমিয়াহতে আপোষ করে, তবে তার তাওহীদের বিশ্বাস কখনোই পূর্ণ বলে গণ্য হবে না। যদি কেউ আল্লাহ্র ক্বুর'আন, তার রাসূলের হাদীস সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও এই বিশ্বাস রাখে যে আল্লাহ্‌ ছাড়া, আল্লাহর নাযিল করা সংবিধান ছাড়া, অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা বৈধ – তবে সে কুফর ও শিরক করলো।(বাস্তবে পুরো ইসলামকেই অঃশ্বিকার করল)

তাওহীদুল হাকিমিয়্যাতে বিশ্বাস করা ছাড়া, শাসন একমাত্র আল্লাহর আইনেই করতে হবে, এ বিশ্বাস ছাড়া কারো আক্বিদা শুদ্ধ হওয়া দূরের কথা, কারো ঈমান থাকা সম্ভব না। এটি ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি মৌলিক বিষয়, যা অস্বীকার করলে ঈমান থাকা সম্ভব না। যে ব্যক্তি যিনা করে, হত্যা করে, মদ খায় সে গুনাহগার মুসলিম। এই কাজগুলো হারাম এবং এ কাজগুলো করার মাধ্যমে কবীরা গুনাহ করলো। কিন্তু যে ব্যক্তি শাসনের ব্যাপারে কাউকে আল্লাহ্র শরীক করে সে কুফর এবং শিরক করলো। এটা হালকা ভাবে নেয়ার মতো কোন বিষয় না। যে আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কারো প্রতি সিজদাহ করে, যে আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কারো কাছে প্রার্থনা করে, যে আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কারো জন্য পশু কুরবানী করে, আর যে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কাউকে আইনপ্রণেতা হিসবে মেনে নেয়, তাদের সবার অবস্থাই এক।

দ্বীনের এরকম মৌলিক কোন বিষয়ে যখন এরকম মারাত্মক ধরনের বিচ্যুতি ছড়িয়ে পড়া নিঃসন্দেহে মুসলিমদের জন্য, উম্মাহর জন্য একটি ভয়াবহ ফিতনা। এটি নিছক কোন তাত্ত্বিক বিষয়ে মতপার্থক্য না, এটি দ্বীনের কোন একটি শাখাপ্রশাখাগত বিষয়ে ইখতিলাফ না, এমনকি যেসব মৌলিক বিষয়ে উম্মাহর মধ্যে দীর্ঘকাল দরে মতপার্থক্য হয়েছে, এটি তেমন কোন বিষয়ও না। যদি শারীয়াহ দ্বারা শাসনকে দ্বীন থেকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে সেটা কিভাবে দ্বীন ইসলাম বলে গণ্য হতে পারে? একারনে মুসলিমদের দায়িত্ব হল সাধ্যমত এ বিষয়টি নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা, এ বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের বিভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা করা, এবং সুস্পষ্ট সত্যকে স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা। আর এ উদ্দেশ্যেই এ সংকলনটি লিখিত হয়েছে।

এ সংকলনে মূলত ৪টি বিষয় তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে-

১। তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ কি?

২। আল্লাহ্র আইন ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসনকারী শাসকের কাফির হবার ব্যাপারে 'উলামাগণের ইজমা

৩। "শারীয়াহ সংস্কার, শারীয়াহ পুনঃব্যাখ্যা, শারীয়াহ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন" -এর পক্ষে আহবানকারীদের প্রতি জবাব

৪। "শাসকমাত্রই তার আনুগত্য করা হল শারীয়াহর বিধান" – এ বিভ্রান্তির অপনোদন

প্রতিটি ক্ষেত্রেই চেষ্টা করা হয়েছে অতীত ও বর্তমানের উলামাগনের বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে সঠিক অবস্থান তুলে ধরার এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের বিভ্রান্তি অপনোদনের। চেষ্টা করা হয়েছে নিজেদের পক্ষ থেকে যথসম্ভব কম কথা বলার। ফলশ্রুতিতে সমস্ত লেখাটিতে কিছুটা যান্ত্রিকতা এসেছে এবং লেখাটি সহজপাঠ্য হয় নি। তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহর বিষয়টিকে সহজ ভাষায় প্রকাশ করা বা বোঝানো যায় না – ব্যাপারটা এমন না। বরং এটি এমন একটি বিষয় যা মানুষের ফিতরার (Natural Disposition) সাথে সম্পৃক্ত। মানুষ ইন্টুইটিভ ভাবেই তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ সম্পর্কে বুঝতে পারে। কিন্তু আমরা জানি, যখন আমরা নিজেদের ভাষায় এ বিষয়টি তুলে ধরবো তখনই এক দল মানুষ দাঁড়িয়ে যাবেন যারা আমাদের দিকে বিদ'আতী, খারেজি, জাহেল, বর্বর, চরমপন্থী, ইত্যাদি বিশেষণ ছুঁড়ে দেবেন। একারণে আমরা 'উলামাগনের কথাগুলোই তুলে ধরেছি, যাতে করে যদি তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহর দাওয়াহ দেওয়া এবং এ বিষয়ে সত্য তুলে ধরাকে কেউ বিদ'আ, চরমপন্থা, অজ্ঞানতা ইত্যাদি মনে করেন, তবে যেন তারা আমাদের সাথে সাথে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর এই 'উলামাদেরকেও একই উপাধিতে ভূষিত করেন। পাশাপাশি এই দালীলিক সংকলনটি আল্লাহ্ চাইলে অপর দা'ঈ ভাইদের জন্য আরও সহজ ভাষায়, আরও সহজবোধ্য এবং সহজপাঠ্য লেখার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এবং সাফল্য শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকেই।

"আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি, অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চুর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, অতঃপর মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।" [আল-আম্বিয়া, ১৮]

তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি?

তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ বলতে আমরা আসলে কি বুঝাচ্ছি? মূলত আমরা তাই বলছি, যা বলেছেন সকল নাবী ও রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম, আর তা হল – আল্লাহ্ হলেন এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, সমকক্ষ নেই, সাদৃশ্য নেই, মহস্রষ্টা, তিনি চিরস্থায়ী, সর্বদা রক্ষনাবেক্ষনাকারী, প্রকৃত কর্মবিধায়ক, তিনিই ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র সত্ত্বা, ইবাদাত শুধুমাত্র তাঁরই জন্য, আনুগত্য শুধু তাঁরই জন্য, হুকুমাত শুধুমাত্র তাঁরই জন্য, সকল প্রশংসা শুধুমাত্র তাঁরই জন্য - আল্লাহ্ ব্যাতীত আর কোন সাহায্যকারী নেই, কোন প্রভু নেই। আমরা তাই সাক্ষ্য দেই, যে সাক্ষ্য তিনি স্বয়ং তাঁর কিতাবে দিয়েছেন, যে সাক্ষ্য দিয়েছেন মালাইকাগণ এবং নাবী রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম। আমরা আরও সাক্ষ্য দেই, রুকু, সিজদা, কসম, তাওয়াফ, সাদাকা, কুরবাণী, দু'আ, আইন প্রণয়ন সব কিছু শুধুমাত্র আল্লাহ্ 'আযযা ওয়া জালের জন্য। সকল প্রকার ইবাদাত ও আনুগত্য তাঁর জন্যই, এতে তাঁর কোন শরীক নেই।

"আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল।" [আল-আন'আম, ১৬২,১৬৩]

জগতসমূহের নিয়মাবলী এবং মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালার জন্য নির্ধারিত বিধানাবলী উভয়ই আল্লাহ্ র আদেশের অন্তর্ভুক্ত। আসমান ও যমীনের দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল কিছুই তাঁর আদেশ অনুসারে পরিচালিত হয়, এবং এতে তাঁর কোন শরীক নেই, একইভাবে আইন প্রণয়নের ও বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁরই, তিনি তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী তা নির্ধারন করেন, এতে তাঁর কোন শরীক নেই। তাই আমরা ইবাদাতের ক্ষেত্রে কাউকে তাঁর শরীক করি না, এবং হুকুমের ক্ষেত্রে, আইন প্রণয়ন ও বিধান দেওয়ার অধিকারের ক্ষেত্রে কাউকে তাঁর শরীক করি না।

"শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা।" [আল-আরাফ, ৫৪]

এ কারনে যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন তা অবৈধ এবং যা আল্লাহ্ হালাল করেছেন তাই বৈধ।

"আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না।" [সূরা ইউসুফ, ৪০]

তাই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া আর কোন বিধানদাতা নেই। যারা নিজেদেরকে আইন প্রণেতা এবং বিধানদাতা বানিয়ে নিয়েছে আমরা তাদের সকলের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতার ঘোষণা দেই, আমরা তাদের সকলকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করি, তাদের উপর আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা আল্লাহ্ কে ছাড়া আর কাউকে রাব্ব হিসেবে গ্রহণ করি না। আমরা আল্লাহ্ কে ছাড়া আর কাউকে মাওলা হিসেবে, ওয়ালী হিসেবে, গ্রহণ করি না, এবং আমরা ইসলাম ছাড়া আর কোন দ্বীনকে স্বীকার করি না। যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া অপরকে বিধানদাতা হিসেবে গ্রহণ করে, এবং তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ্ র অবাধ্যতায়, এবং আল্লাহ্ র বিধানের বিরুদ্ধে মিথ্যা বিধানদাতাদের বিধানের অনুসরণ করে – তারা আল্লাহ্ ব্যাতীত অপরকে রাব্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম ব্যতীত অপর দ্বীন গ্রহণ করেছে। [শাইখ আবু মুহাম্মাদ আসিম আল-মাক্বদিসির "এই হল আমাদের আক্বীদা" গ্রন্থের "আল্লাহর একত্ব" শীর্ষক অংশ থেকে গৃহীত। এ অংশে শাইখের বক্তব্য হুবহু উদ্ধৃত করা হয় নি, বাক্যরীতি, এবং বাক্যের ক্রমধারা সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করা হয় নি, মূল ভাব নেয়া হয়েছে।]

তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ কি কোন বিদ'আ?

যারা বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন ভাবে এবং বিভিন্ন অজুহাতে তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহর দাওয়াহর বিরোধিতা করেন তাদের মুখে একটি কথা প্রায়ই শোনা যায়, আর তা হল, "তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ বলে কিছু সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইনের সময়ে ছিল না, এটি একটি বিদ'আ।" আবার অনেকে বলেন -"তাওহীদের শ্রেণীবিভাগ তিনটি আর তা হল – তাওহীদ আর-রুবুবিয়্যাহ, তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস সিফাত, এবং তাওহীদ আল-উলুহিয়্যাহ। তোমরা নতুন চতুর্থ শ্রেণী কোত্থেকে আনছো?"

এক্ষেত্রে জবাব দেবার আগে, আমরা দুটো প্রশ্ন করতে চাই।

প্রথম প্রশ্ন, তাওহীদের যে তিনটি শ্রেণীবিভাগের কথা আপনি বললেন, সেগুলোর এই নামগুলো কি সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইনের সময় প্রচলিত ছিল?

দ্বিতীয় প্রশ্ন, আপনি কি "তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ" এ দুটি শব্দকে দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কিছু বলছেন? নাকি শব্দ দুটি দ্বারা যে ধারণাটিকে প্রকাশ করা হচ্ছে তাকে দ্বীনে নব-উদ্ভাবিত বলছেন?

যদি ব্যক্তিটি সত্যবাদী হয় এবং জাহেল না হয়, তবে সে আপনাকে জানাবে সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইনের সময় এই তিনটি নাম দিয়ে এই তিনভাবে তাওহীদের শ্রেণীবিভাগ করা হয় নি। বর্তমানে আমরা যে তিনটি শ্রেণীবিভাগ দেখি, এটি এভাবে চলে আসছে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহর সময় থেকে। তবে তার অর্থ এই না শাইখ ইবন তাইমিয়্যাহ দ্বীনের মধ্যে কোন কিছু নতুন উদ্ভাবন করেছিলেন। মূলত সাহাবাদের রাদ্বিয়ালাহু আনহুম তাওহীদের ব্যাপারে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার সাথে কোন কিছু নিজে থেকে যোগ করেন নি। কিন্তু এটাও সত্য যে সাহাবাদের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম সময় এভাবে তিনভাগে ভাগ করে, এই তিনটি নাম দিয়ে তাওহীদ শেখানো হত না। ব্যাপারটা হল ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহর সময়ে প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল বিশেষ ভাবে তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাতকে সংজ্ঞায়িত করার, কারণ সে সময় আল্লাহর সিফাত অস্বীকারকারীদের ফিতনা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। একারণে প্রয়োজনের তাগিদে সাহাবা রাদ্বিয়ালাহু আনহুম ওয়া আজমাইনের তাওহীদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংকেই ইবন তাইমিয়্যাহ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন, বিশেষ ভাবে তাওহীদ আল আসমা-ওয়াস সিফাতের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য। যদি মানুষের মধ্যে তাওহীদের ব্যাপারে সাহাবাদের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতো তবে, এই শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন হত না, কিন্তু যেহেতু মানুষের মধ্যে তা ছিল না তাই এরকম শ্রেণীবিভাগ করাই ছিল সময়ের দাবি। কিন্তু একারণে কেউ বলতে পারবে না যে ইবন তাইমিয়্যাহ নতুন কোন জিনিস তাওহীদের মধ্যে এনেছেন। তিনি শুধু এটুকু বলেছেন যে রুবুবিয়্যাহ, উলুহিয়্যাহ এবং আসমা-ওয়াস-সিফাতে বিশ্বাস, এই তিনটি অংশ নিয়েই গঠিত তাওহীদের পূর্ণ বিশ্বাস।একইভাবে আমরাও নতুন কোন কিছু তাওহীদে আনছি না, আমরা শুধুমাত্র তাওহীদের যে অংশটি ব্যপকভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে সেটি তুলে ধরার জন্যই তাওহীদের এ দিকটির উপর জোর দিচ্ছি।

দ্বিতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে যদি বলা হয়, "তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ" এ শব্দদুটিকে নব উদ্ভাবিত বলা হচ্ছে, তবে আমরা স্বীকার করি এ দুটো শব্দ নব উদ্ভাবিত। ক্বুর'আন ও সুন্নাহতে এ শব্দাবলী এভাবে নেই। তবে শুধুমাত্র এটাই যদি বিদ'আ হবার জন্য যথেষ্ট হয় তবে "আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আ", "উসুল-আল-ফিক্বহ", উসুল আল-হাদিস, আহাদ, মাশহুর, উলুম আল-কূর'আন, "উসুল আল তাফসির" – এ শব্দগুলোও এভাবে ক্বুর'আন ও সুন্নাহতে নেই। তবে এগুলোকেও বিদ'আ বলা হবে? তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত, ক্বুর'আনে নেই, হাদিসে নেই, সাহাবাদের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম সময় এরকম কোন টার্ম প্রচলিত ছিল না, তবে আমরা এটাকেও বিদ'আ বলবো? "আক্বীদা" শব্দটি ক্বুর'আনে তো দূরে থাক, কোন জাল হাদীসেও নেই, তবে কি আমরা আক্বীদা নিয়ে যারা কথা বলে, "সহীহ আক্বীদার" দাওয়াহ দেয় তাদেরকেও মুবতাদী বলবো?

সুতরাং শুধুমাত্র এই শব্দাবলী এভাবে ক্বুর'আন হাদিসে না আসার, কারণে এই শব্দাবলীর দ্বারা যে ধারণাটি প্রকাশ করা হয় সেটা বিদ'আতে পরিণত হয় না, যেমন তাওহীদ আল আসমা ওয়াস-সিফাত বিদ'আত না। আর যদি কেউ বলে "ঠিক আছে, বুঝলাম এটা বিদ'আ না, কিন্তু শুধু হাকিমিয়্যাহর দাওয়াহ দেওয়াটা কেমন ব্যাপার?" তবে সেক্ষেত্রে জবাব হবে, আমরা শুধুমাত্র হাকিমিয়্যাহর দাওয়াহ দিচ্ছি না, তবে আমরা এটাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি, কারণ এ ব্যাপারে উম্মাহর মধ্যে বিভ্রান্তি এবং অজ্ঞানতা এবং এ ব্যাপারে কথা বলার মতো দা'ঈ এবং উলামা দুঃখজনকভাবে আজ কম। যদি পরিস্থিতির বিবেচনায় ইবন

তাইমিয়্যাহর তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাত নিয়ে গুরত্ব দেওয়া, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাবের বিশেষ ভাবে তাওহীদ আল-ইবাদাত নিয়ে গুরত্ব দেওয়া বিদ'আ না হয় তবে তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়াও বিদ'আ না। এটা শুধুমাত্র পরিস্থিতির বিবেচনায় অগ্রাধিকার নির্ধারন করা। বিশেষত যখন 'উলামা অনেক থাকা সত্ত্বেও তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ নিয়ে কথা বলার মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না।

এ ব্যাপারে উপসংহার হিসেবে শাইখ আবু বাসীর আত-তারতুসির বক্তব্য তুলে ধরছি –

তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ অর্থ হল বিচার (হুকুম) এবং আইন প্রণয়ণের (তাশরী') অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার। আধিপত্য, রাজত্ব, সার্বভৌমত্ব এবং সৃষ্টির বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যেমন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কোন শরীক নেই, তেমনি ভাবে বিচার (হুকুম) এবং আইন প্রণয়ণের (তাশরী') ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কোন শরীক নেই।

যেমন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন – "... আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" [আল আন'আম, ৪০]

এবং তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন-

"...আল্লাহ বিচার করেন, আর তাঁর বিচারকে (হুকুম) পশ্চাতে নিক্ষেপ করার কেউ নেই।" [আর-রা'দ, ৪১]

এবং তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন-

"..তিনি নিজ হুকুম ও বিধানের [ফী হুকমিহি] কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না।" [আল-কাহফ, ২৬]

এবং তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন-

“তারা কি জাহেলী যুগের বিচার- ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?” [আল-মায়’ইদা, ৫০]

এবং-

“তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন – ওর মীমাংসাতো (হুকুম) আল্লাহ্ রই নিকট।” [আশ-শূরা, ১০]

এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেছেন-

“...যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।” [আল আন’আম, ১২১]

এছাড়াও অন্য আরও সুস্পষ্ট (মুহকাম) আয়াতের দ্বারা তাওহীদের এ শ্রেণীটি (অর্থাৎ তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ) প্রমাণিত, এবং এও প্রমাণিত যে তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহতে বিশ্বাস করা ব্যাতীত কারো ঈমান সম্পূর্ণ হবে না।

এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহিহ হাদিসে আছে - “নিশ্চয় আল্লাহ্ হচ্ছেন আল-হাকাম (বিচারক), এবং হুকুম (বিধান, আইন প্রণয়ন) হল তাঁর অধিকার।” [আবু দাউদঃ ৪৯৫৫, আন-নাসাঈ ৮/২২৬, আল-আলবানীর মতে সাহীহ]

প্রশ্ন হল তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ কি তাওহীদের আলাদা একটি শ্রেণী, নাকি এটি তাওহীদুল ‘উলুহিয়্যাহর (যাকে তাওহীদুল ইবাদাহও বলা হয়) অন্তর্ভুক্ত?

আমি বলিঃ এটি পৃথক একটি শ্রেণী নয়, তবে তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহর বিশ্বাসের মধ্যে এমন বিষয় আছে যা তাওহীদুল উলুহিয়্যাহর ভেতরে পরে, এ বিশ্বাসের ভেতরে এমন বিষয় আছে যা তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহর ভেতরে পরে, আবার এর মধ্যে এমন বিষয় আছে যা তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস সিফাতের ভেতরেও পরে।

কিন্তু যখন আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন তা ব্যাতীত কুফর ও তাগুতের সংবিধান দিয়ে শাসনের শিরক উম্মাহর মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়ে তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহর কথা বলা, এবং এর আবশ্যকতার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষন করা দরকারী হয়ে পড়ে। এবং লোকেদের কাছে এও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় যে, তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহর উপর বিশ্বাস আবশ্যক এবং একে বাদ দিয়ে তাওহীদুল 'উলুহিয়্যাহর- বিশ্বাস করা সম্ভব না।

ধরুন, আপনি দেখলেন কিছু লোক আল্লাহ ব্যাতীত অন্য কারো প্রতি আনুগত্যকে শিরকের পর্যায়ে নিয়ে গেছে [যেমন পীরের প্রতি আনুগত্য, যা উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে দেখা যায়]। আপনি তাদের বললেন, “তাওহীদ আত-তাআ’আহ এ বিশ্বাস আবশ্যক। এটা আপনাদের জন্য আবশ্যক যে আপনারা আল্লাহ্‌ ব্যাতীত আর কারো আনুগত্য করবেন না।”

আপনার এ কথা সঠিক ও উপযুক্ত বলেই গণ্য হবে। এক্ষেত্রে আপনার বিরোধিতা করা এবং বলা - “তুমি এক নতুন তাওহীদ নিয়ে এসেছো, যাকে তুমি তাওহীদ আত-তাআ’আহ বলছো” কিংবা বলা, “তুমি তাওহীদ আল-'উলুহিয়্যাহ ছাড়া নতুন এক তাওহীদ এনেছো” – সমীচীন না, জায়েজও না।

অথবা ধরুন, আপনি দেখলেন কিছু লোক আল্লাহ্‌ ও নিজেদের মধ্যে অন্য কাউকে মধ্যস্ততাকারী (যেমন ওলি-আউলিয়া, কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ) হিসেবে নিয়েছে ও ভালোবাসার (মাহাব্বা) মাধ্যমে তাদের আল্লাহ্‌ র সাথে শরীক করছে (অর্থাৎ এমনভাবে সৃষ্টিকে ভালোবাসছে যেভাবে শুধু আল্লাহ্‌ কে ভালবাসতে হবে) এবং আল ওয়ালা ওয়াল বারা’র দিক দিয়ে শিরক করছে (অর্থাৎ আল্লাহর পছন্দ ও অপছন্দের ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও সম্পর্কছিন্ন করার নীতি গ্রহণের বদলে, কোন সৃষ্টির পছন্দ ও অপছন্দের ভিত্তিতে তা করছে)।

সুতরাং এমন অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আপনি তাদের বললেন, ভালোবাসার ক্ষেত্রেও তাওহীদে বিশ্বাস করতে হবে, এবং ব্যক্তির কাছে সর্বাধিক প্রিয় হতে হবে আল্লাহ্‌ এবং একমাত্র আল্লাহ্‌ । এটা কিন্তু তাওহীদুল উলুহিয়্যাহর জায়গায় নতুন কোন তাওহীদ আমদানী করা নয়। এবং তাওহীদ আল-মুহাব্বাহ নিয়ে আপনার বক্তব্যও কোনভাবেই বিদ’আ নয়।

যদি আপনি এটা অনুধাবন করতে সক্ষম হন, তাহলে আপনি এটাও বুঝবেন, যারা তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ প্রচারের বিরোধিতা করে, তাদের দ্বারা এর বিরুদ্ধে যা কিছু বলা হচ্ছে, যা কিছু বিরোধিতা করা হচ্ছে তার কোন ন্যায্যতা নেই। এ বিরোধিতার অন্তর্নিহিত কারণ হল তাওহীদের এ দিকটিকে ছোট করে দেখানো, এবং তাওয়াগীতের দ্বারা তাওহীদের এই অবিচ্ছেদ্য অংশটির ব্যাপারে যে অস্বীকার ও সীমালঙ্ঘন করা হয়েছে সেটার পক্ষে, এবং এ ব্যাপারে নিজেদের নীরবতার পক্ষে সাফাই

দেওয়া।

আর যদি আপনি তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ সম্পর্কে জানার জন্য কোন বই পড়তে আগ্রহী হন, তবে জেনে রাখুন এ বিষয়ে বিপুল সংখ্যক কিতাবাদি রয়েছে, যার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ হল আল্লাহ্‌ র কিতাব এবং তারপরে নাবীর ﷺ সুন্নাহর কিতাব সমূহ। এছাড়া রয়েছে ইবন তাইমিয়্যাহ, ইবন কাইয়্যিম, ইবন আবদুল ওয়াহহাব এবং তার পৌত্রদের আক্বিদার কিতাবাদি – আল্লাহ্‌ তাদের সকলের উপর রহম করুন। সমসাময়িক কালের ব্যক্তিত্বদের মাঝে রয়েছে সাইদ কুতবের কিতাব সমূহ, আল্লাহ্‌ তার উপর রহম করুন। বিশেষ করে আল-যিলাল, আল মা'আলীম, "খাসা'ইস আল-তাসাউউর", এবং "মুক্বাউয়িমাত আত-তাসাউউর আল-ইসলামী"।

একই সাথে তার ভাই মুহাম্মাদ কুতুবের কিতাবাদি পড়তে পারেন, এবং এ বিষয়ের উপর খাস ভাবে কিছু কিতাব রয়েছে, যেমন ভাই শাইখ আবু ইথার রচিত "তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ" এবং আমাদের ভাই শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাক্বদিসির কিতাব এবং প্রবন্ধসমূহ। এ অধমেরও এ ব্যাপারে বেশ কিছু রচনা রয়েছে। কিতাব তো আছে অসংখ্য, কিন্তু কোথায় তাদের অধ্যায়নকারী এবং কোথায় তাদের উপর 'আমলকারী?

আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসনকারী শাসকের কাফির হবার ব্যাপারে 'উলামাগণের ইজমা

আগেই বলা হয়েছে আমরা এ সংকলনে শারীয়াহ ব্যাতীত অপর কিছু দ্বারা শাসনকারী শাসকের কাফির হবার ব্যাপারে 'উলামাগণের ইজমা থাকার ব্যপারে অতীত ও বর্তমানের উলেমাগণের বক্তব্য তুলে ধরবো। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়টি নিয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়ালা জামা'আর 'উলামাগনের যে অগণিত বক্তব্য রয়েছে, যেগুলো থেকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়-

১। শারীয়াহ দ্বারা শাসন করা আবশ্যক(ফরজ)

২। যে শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে না এবং আল্লাহর বিধান বাতিল করে নিজে আইন প্রণয়ন করে সে কাফির

৩। যে আল্লাহর অবাধ্যতা করে, আল্লাহর বিধানের বদলে আইন প্রণয়নকারী কোন শাসকের আনুগত্য করে, আল্লাহর আইনের বদলে সৃষ্টির আইনকে বিধান হিসেবে পছন্দ করে এবং গ্রহণ করে, এবং আল্লাহর শারীয়াহর বদলে সৃষ্টির শারীয়াহ অনুসরণের আহবান জানায়, সে কুফর এবং শিরক করেছে।

এ অংশটিতে আমরা এ ব্যাপারে যাদের বক্তব্য তুলে ধরছি তারা হলেন –

ইমামুল আহলুস সুন্নাহ আহমদ ইবন হানবাল

ক্বাদি 'ইয়াদ

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ

শাইখ ইবনুল কাইয়্যিম

শাইখ ইবনে কাসীর

শাইখ বাদরুদ্দীন আইনী

শাইখ আব্দুল লতিফ ইবন আব্দুর রাহমান

শাইখ মুহাম্মাহ আল-আমিন আশ-শিনক্বিতি

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম

শাইখ আহমেদ শাকির

শাইখ বিন বায

শাইখ ইবন উসাইমীন

শাইখ আবদুল রাযযাক ‘আফিফি

শাইখ আহমেদ মুসা জিব্রিল

শাইখ সুলাইমান বিন নাসির আল ‘উলওয়ান

সায়্যেদিনা ইবন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

সাইয়্যিদিনা ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য

এটুকুর পর আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে এব্যাপারে বক্তব্য এত অধিক সংখ্যক যে তা সব সংকলিত করা দুঃসাধ্য একটি কাজ। আশা করা যায়, আল্লাহ্‌ চাইলে যারা সত্যান্বেষী তাদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট হবে।

‘উলামাগণের বক্তব্যঃ

এ অংশটি পড়ার সময় পাঠকের মনে হতে পারে বার বার একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। এমনটা মনে হওয়া স্বাভাবিক, কারণ প্রজন্ম এবং শতাব্দী ভেদে ‘উলামাগন এ বিষয়ে আইডেন্টিকাল বক্তব্য দিয়েছেন। এবং এটা এ বিষয়ে ইজমার থাকার আরেকটি প্রমাণ। আমি পাঠককে অনুরোধ করবো ধৈর্য ধরে, একটু কষ্ট হলেও ‘উলামাগনের সবার বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে পড়ার যাতে করে; প্রথমত, এ ব্যাপারে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর কারো মধ্য যেন না থাকে। দ্বিতীয়ত, এ ব্যাপারে ‘উলামাগনের অবস্থান কতোটা কঠোর তা অনুধাবন করা এবং আমাদের সময়ে যারা এ বিষয়ে শিথিলতা অবলম্বন করছে, নিরবতা পালন করছে এবং এ বিষয়ে অপব্যাখ্যা করছে ও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, তাদেরকে এই ‘উলামাগনের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা।

ইমামুল আহলুস সুন্নাহ আহমদ ইবন হানবালঃ

তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে আল্লাহ ব্যতীত তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত ৩১]

এ আয়াতের তাফসীরে ইমামুল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা’আ শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবন হানবাল (রঃ)বলেন –

“এই আয়াতের ব্যাপারে আদি ইবন হাতিম তাই রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন –

তারা (ইহুদী-খ্রিষ্টানরা) তো তাদের আলেম ও দরবেশদের ইবাদাত করতো না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেনঃ হ্যাঁ, অবশ্যই তারা তা (আলেম ও দরবেশদের ইবাদাত) করেছিল। আল্লাহ্ যা হারাম করেছিলেন, আলেম ও দরবেশগণ তা হালাল সাব্যস্ত করেছিল, আর আল্লাহ্ যা তাদের জন্য হালাল করেছিলেন, তা আলেম ও দরবেশগণ হারাম সাব্যস্ত করেছিল। আর ইহুদী-খ্রিষ্টানরা এ ব্যাপারে তাদের (আলেম ও দরবেশদের) আনুগত্য করেছিল। আর এভাবে তারা তাদের (আলেম ও দরবেশদের) ইবাদাত করেছিল।” [আত তিরমিযী থেকে বর্নিত, হাদিস নং ৩০৯৫, কিতাব উত তাফসীর, এবং আল বায়হাকির সুনানে বর্ণিত, খন্ড ১০, হাদিস ১১৭ - হাসান]

হাদিসে বলা হয়েছে, যেহেতু তারা আনুগত্য করেছে, তাই এটা শিরক। কোথাও বলা হয় নি যে ইহুদী-খ্রিষ্টানরা বলেছিল “আলেম ও দরবেশগণ হলেন আল্লাহর পাশপাশি আমাদের প্রভু”। একজন মুসলিমের চিহ্ন হল, প্রকৃত মুসলিম আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে খুশি থাকে। তার মনে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের প্রতি কোন বিদ্বেষ থাকে না। এবং সে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে, যদিও আল্লাহর আদেশ নিষেধ তার নিজের খেয়াল-খুশি, বা স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়, কিংবা তার নিজের দলের বা তার শাইখের কথার বিরুদ্ধে যায়।” [মাদারিজ উস সালিকিন, খন্ড ২, পৃ ১১৮]

এছাড়া ইমাম আহমাদ (রঃ)আরও বলেছেনঃ

“কোন বস্তু, যার হারাম হবার ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে এবং তা মুসলিমদের মধ্য সুবিদিত, এবং এতে বিভ্রান্তির কোন সুযোগ নেই কারণ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দালীল আছে – যেমন শূকরের মাংস, যিনা ও অন্যান্য যেসব বিষয় যার ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই – যদি এমন কোন বস্তুকে কেউ হালাল মনে করে, হালাল বলে বিশ্বাস করে, তবে সে কাফির। সালাত ত্যাগকারী যে কারণে কাফির, এই ব্যক্তিও সেই একই কারণে কাফির, আর এ বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি…”[আল মুগনী, ১২/২৭৬, দার হাজর থেকে প্রকাশিত ব্যাখ্যা সংবলিত সংস্করণ]

ক্বাদি ‘ইয়াদঃ

মহান মালিকি ‘আলিম ক্বাদ্বি ‘ইয়াদ ইবন মুসা ইবন ‘ইয়াদ ইবন ‘আমরু আল-ইয়াহসাবি আল আন্দালুসি রাহিমাহুল্লাহ আদি ইবন হাতিমের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হাদিস সম্পর্কে বলেন-

কেউ “লা ইলাহা ইলাল্লালাহ” বলার অর্থ সে ঈমান গ্রহণ করেছে এটা প্রযোজ্য শুধুমাত্র সেসব লোকের ক্ষেত্রে যারা ইতিপূর্বে

মুশরিক ছিল [অর্থাৎ কোন মুশরিক যখন এ সাক্ষ্য দেবে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” তখন সে ঈমান এনেছে বলে ধরে নেওয়া হবে]। কিন্তু যারা ইতিমধ্যেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহা সাক্ষ্য দিচ্ছে, কিন্তু একই সাথে কুফরও করেছে, এ সাক্ষ্য (শুধুমাত্র মুখে কালিমা উচ্চারণ) তাদের রক্ত ও সম্পদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট না। [আশ-শিফা, খণ্ড ২, পৃ ২৩০-২৫০]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহঃ

আল ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহর এ বিষয়ে বেশ কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হল। শাইখের বক্তব্য এবং শাইখের ছাত্র ইবন কাসীর এবং ইবনুল কাইয়্যিমের বক্তব্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন কারণ উম্মাহর বর্তমান অবস্থার সাথে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে শুধুমাত্র শাইখদের সময়ই তুলনীয়, কারণ তাঁরা বেঁচে ছিলেন এমন এক সময়ে যখন তাতারদের আক্রমণে খিলাফাতের পতন ঘটেছিল, তাতাররা মুসলিমদের উপর কর্তৃত্বে আসীন হয়েছিল এবং তারা মুখে ইসলাম গ্রহন করলেও আল্লাহর শারীয়াহ ব্যতীত মানব রচিত সংবিধান আল-ইয়াসিক দ্বারা শাসন করছিল।

১।আল্লাহ্‌ র আইন ব্যাতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসন করার ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্যঃ

“আমরা বলি, এমন কোন দল/ফিরকা/জামা’আ যা ইসলামের তর্কাতীত, সন্দেহাতীত, অনস্বীকার্য এমন কোন বিধান ত্যাগ করে, যার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর প্রজন্মের পর প্রজন্ম একমত কোন রকম বিরাম ছাড়াই; তবে বিধান ত্যাগকারী সেই দলের বিরুদ্ধে ইমামদের ইজমা অনুযায়ী যুদ্ধ করা আবশ্যক। এমনকি যদি তারা দুটি কালিমার সাক্ষ্য দেয় (আশহাদু আল্লাহ্‌ ইলাহ ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) তবুও।” [মাজমু’আ ফাতাওয়া, খন্ড ৪, বাব উল-জিহাদ]

“সুতরাং তারা যদি দুই শাহাদাতিন (দুই কালিমা) উচ্চারণও করে, কিন্তু দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় থেকে বিরত থাকে তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, যতক্ষণ না তারা সালাত আদায় করবে। আর যদি তারা যাকাত দানে বিরত থাকে, তবে যাকাত দেয়ার আগ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। একইভাবে যদি তারা রমাদ্বানে সিয়াম পালনে বিরত থাকে, কিংবা আল্লাহর ঘরে হাজ্জ করা থেকে বিরত থাকে, কিংবা অশ্লীলতা-ফাহিশা নিষিদ্ধে অস্বীকৃতি জানায়, অথবা যিনা বা জুয়া, বা মদ্যপান এবং ইসলামী শারীয়াতের অন্যান্য যেসব কাজ ও জিনিস নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেগুলো নিষিদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানায়, কিংবা তারা যদি জান-মাল-সম্মান, ব্যবস্থাপনা, বিচার ও মীমাংসার ক্ষেত্রে কুর’আন ও সুন্নাহর আইন প্রয়োগে অস্বীকৃতি জানায়, কিংবা তারা যদি ভালো কাজে সাহায্য ও মন্দ কাজে বাধা দেয়া থেকে বিরত থাকে, কিংবা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা

থেকে বিরত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না কাফিররা অবনত মস্তকে জিযিয়া দেয় – তবে এই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। সুতরাং এমন সব ক্ষেত্রে যখন দ্বীনের কিছু অংশ আল্লাহ্‌ র জন্য আর কিছু অংশ অন্যদের জন্য করে ফেলা হয়, মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করা যতক্ষণ না শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।" [মাজমু'আ ফাতাওয়া, খন্ড ৪, বাব উল জিহাদ]

এটা হল মুরতাদীনের ব্যাপারে শাইখুল ইসলামের বক্তব্য। এখানে শাইখ স্পষ্ট ভাবে শারীয়াহ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা, শারীয়াহ দিয়ে শাসন প্রত্যাখ্যানকারীদের মুরতাদীনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যদি তারা সালাত আদায় করে, যাকাত দেয়, এবং দুই শাহাদাহ উচ্চারণ করে - তবুও। আর যেসব আলেম এসব শাসকের আনুগত্যের কথা বলে তাদের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্যঃ

"যদি কোন শাইখ/আলেম কুরআন ও সুন্নাহ হতে অর্জিত শিক্ষা অনুযায়ী আমল ত্যাগ করে এবং এমন বিচারকের অনুসরণ করে যে আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর শিক্ষা অনুযায়ী বিচার করে না, সে তখন একজন ধর্মত্যাগী কাফির হিসেবে বিবেচিত হবে যে দুনিয়াতে আখিরাতে শাস্তি পাবার উপযুক্ত। এই হুকুম সেসমস্ত উলামাগনের বেলায়ও প্রযোজ্য যারা ভয়ের কারণে মংগোলদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন, এবং এর মাধ্যমে লাভবান হতে চেয়েছিল। এই উলামারা অজুহাত দিয়েছিল মংগোলদের মধ্যে কেউ কেউ কালিমা পড়ছিল, আর তাই তারা মুসলিম।" [মাজমু আল ফাতাওয়া, খন্ড ৩৫, পৃ ৩৭৩]

২। তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত ৩৩]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ শারীয়াহ এবং ইসলামের অবিচ্ছেদ্য সূত্র সম্পর্কে এই আয়াতের আলোকে বলেনঃ

"ইসলাম অর্থ সম্পূর্ণভাবে একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। সুতরাং যে আল্লাহ্‌ র কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং একই সাথে আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কারো কাছে আত্মসমর্পণ করে, তবে সে একজন মুশরিক। আর যে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করে না, সে ঔদ্ধত্যের কারণে আল্লাহ্‌ র ইবাদাত করে না। মুশরিক এবং এই উদ্ধত ব্যক্তি, দুজনেই কাফির।

একমাত্র আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল, আপনি শুধুমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করবেন। এটাই হল দ্বীন ইসলাম, আর এছাড়া অন্য কিছু আল্লাহ্‌ গ্রহণ করবেন না। আর এই আনুগত্যের শর্ত হল সকল সময়ে আল্লাহর আনুগত্য করা, এবং আল্লাহ্‌ যেসময়ে যে কাজের আদেশ দিয়েছেন, সে সময়ে সে কাজ করা।" [মাজমু'আ ফাতাওয়া, খণ্ড ৩, পৃ ৯১]

৩। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেছেন -

"যদি কেউ মনে করে নবী কারীম ﷺ এর দিকনির্দেশনার চাইতে তার নিজের দিকনির্দেশনা উত্তম, কিংবা সে যদি মনে করে আউলিয়াদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছেন যাদের জন্যে শারীয়াহর গন্ডির বাইরে যাওয়া জায়েজ, যেমন আল-খিযির, মুসা আলাইহিস সালামের শারীয়াহর বাইরে ছিলেন – তবে সে ব্যক্তি কাফির। তাকে তাওবাহ করতে বলতে হবে এবং হত্যা করতে হবে (যদি তাওবাহ না করে)। কারণ মুসা আলাইহিস সালামের দাওয়াহ ও রিসালাত বৈশ্বিক ছিল না, তাই আল-খিযির বাধ্য ছিলেন না মুসা আলাইহিস সালামের শারীয়াহর অনুসরণে (তাঁদের উভয়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। (মুসা আলাইহিস সালামের নাবুওয়্যাত ও রিসালাত ছিল একটি ক্বওমের উপর সীমাবদ্ধ, কিন্তু নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর রিসালাত বৈশ্বিক। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য ফরয নাবী মুহাম্মাদ ﷺ কে রাসূল হিসেবে মেনে নেওয়া এবং তাঁর ﷺ আনীত শারীয়াহর অনুসরণ করা)" [ডঃ আবদুর রাহমান ইবন সালিহ আল মাহমুদ রচিত "মানবরচিত আইন বনাম শারীয়াহ" কিতাবের ১৭০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত]

৪। "হে কারাগারের সঙ্গীরা! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" [সূরা ইউসুফ, ৩৯,৪০]

এ আয়াতদ্বয়ের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেনঃ বিধান শুধুমাত্র আল্লাহর, এবং তাঁর রাসূলরা (আলাইহিমুস সালাম) তাঁর পক্ষ হয়ে তা পৌঁছে দিয়েছেন। রাসূলদের সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সিদ্ধান্ত এবং রাসূলদের আনুগত্য করাই আল্লাহর আনুগত্য করা। কোন রাসূল যে কাজের আদেশ দেন, বা যে সিদ্ধান্ত দেন, বা দ্বীনের মধ্যে যা যুক্ত করেন, সেগুলোর অনুসরণ করা এবং রাসূলের আনুগত্য করা মানুষের উপর বাধ্যতামূলক, কারণ আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে এরূপই নির্ধারন করেছেন। [মাজমু' আল-ফাতাওয়া, ৩৫/৩৬১-৩৬৩; আরও দেখুন পৃঃ ৩৭২,৩৮৩]

৫। এটি ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যে আল্লাহর শারীয়াহ ছাড়া অন্য কিছু অনুসরণকে বৈধতা দেয়, সে কাফির। আর তার কুফর হল

ঐ ব্যক্তির কুফরের ন্যায় যে কিতাবের কিছু আয়াত বিশ্বাস করে আর কিতাবের অন্য কিছু আয়াত অস্বীকার করে। [মাজমু'আ ফাতাওয়া, খন্ড ২৮, পৃঃ ৫২৪]

'আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিমঃ

'আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম ইসলামী শারীয়াহ ব্যাতীত অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা শাসকের কাফির হবার ব্যাপারে 'উলামাগণের ইজমার উল্লেখ করার, বৈধতা ও অবৈধতা (হালাল ও হারাম) শুধুমাত্র আল্লাহর শারীয়াহ দ্বারা নির্ধারিত হবার ব্যাপারে বলেন বলেন-

"ক্বুর'আন ও প্রমাণিত ইজমার বক্তব্য হল দ্বীন ইসলামের আগমনের ফলে পূর্বের সকল ধর্ম/দ্বীন রহিত হয়ে গেছে। তাই যে ক্বুর'আন ছেড়ে তাওরাত ও ইঞ্জিলে যা আছে তার অনুসরণ করবে, সে কাফির। আল্লাহ্ তাওরাত ও ইঞ্জিলের সকল বিধান রহিত করে দিয়েছেন, এবং রহিত করে দিয়েছেন অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের সকল বিধানকে। তিনি জ্বিন ও মানুষ, এই দুই জাতির উপর ইসলামের বিধান মানাকে ফরয/আবশ্যক করে দিয়েছেন। সুতরাং ইসলাম যা নিষিদ্ধ করেছে তা ছাড়া আর কিছুই নিষিদ্ধ না। আর ইসলাম যা আবশ্যক করেছে এর বাইরে আর কিছুই আবশ্যক না। [আহকাম আহল আয-যিম্মা, ১/২৫৯]

ইবনুল কাইয়্যিম তুলে ধরেছেন উলামাগনের ইজমা হল ক্বুর'আন ব্যাতীত অন্য আসমানী কিতাবের মাধ্যমে প্রাপ্ত শারীয়াহর অনুসরণকারী কাফির। তবে সে ব্যক্তির কি অবস্থা যে মানবরচিত সংবিধানের অনুসরণ করে? আর সে শাসকের কি অবস্থা যে আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা হালাল করে, এবং আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করে? যে আল্লাহর শারীয়াহকে বাতিল ঘোষণা করে এবং নিজের ইচ্ছেমতো শারীয়াহ বানিয়ে নেয়?

হাফিয ইবনে কাসীরঃ

এই বক্তব্যটি বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আল্লামা আবুল ফিদা ইসমাইল ইবন উমার ইবন কাসির রাহিমাহুল্লাহর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে সাধারণভাবে, এবং বিশেষ করে এই ফাতাওয়ার গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে, মাযহাব-মানহাজ

নির্বিশেষে উম্মাহ একমত। দ্বিতীয়ত, যে প্রেক্ষাপটে ইবন কাসির রাহিমাহুল্লাহ এই ফাতাওয়া দিয়েছিলেন, তার সাথে বর্তমান প্রেক্ষাপটের সুগভীর ও মৌলিক সাদৃশ্য বিদ্যমান।

"যে রাজকীয় বিধানসমূহের দ্বারা তাতাররা শাসনকার্য পরিচালনা করে, এগুলো গৃহীত হয়েছে তাদের রাজা গেঙ্গিস খানের রচিত কিতাব আল-ইয়াসিক থেকে। গেঙ্গিস খান এই কিতাব রচনা করেছিল বিভিন্ন শারীয়াহ থেকে নানা আইন একত্রিত করে। এখানে ইহুদী, নাসারা, ইসলামী শারীয়াহ সবগুলো থেকেই কিছু কিছু গ্রহণ করা হয়েছে, এবং সাথে আরো অন্যান্য উৎস সমূহ থেকেও। এছাড়া এই কিতাবে গেঙ্গিস খানের নিজের চিন্তাপ্রসূত নানা মনগড়া আইনও আছে। আর এভাবে চেঙ্গিসের উত্তরসূরিরা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের ﷺ সুন্নাহ অনুযায়ী শাসনের বদলে এই কিতাবের আইনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং অনুসরণ করেছে। যারা এরকম করে তারা কাফির এবং তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ যুদ্ধ করতে হবে, যতক্ষন না তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যা নির্ধারণ করেছেন তদানুযায়ী শাসন করার দিকে ফিরে আসে। যাতে করে, ছোট বা বড়, কোন বিষয়েই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া আর কারো বিধান না চলে।" [তাফসির ইবন কাসির, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৭, সূরা মায়'ইদার তাফসীর আয়াত ৪০ থেকে ৫০ দ্রষ্টব্য]

একই সাথে আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে ইবন কাসির রাহিমাহুল্লাহ এই বিষয়ে কি বলেছেন বিবেচনা করুনঃ

"অতএব কেউ যদি খাতুমুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ﷺ এর উপর নাযিলকৃত শারীয়াহ ছেড়ে, পূর্বে নাযিলকৃত অন্য কোন শারীয়াহ দ্বারা বিচার করে ও শাসনকার্য চালায়, যা রহিত হয়ে গেছে, তবে সে কাফির হয়ে গেছে। তবে (চিন্তা করুন) সেই ব্যক্তির অবস্থা কি রূপ যে আল-ইয়াসিকের ভিত্তিতে শাসন করে এবং একে ইসলামী শারীয়াহ'র উপর স্থান দেয়? এরকম যেই করবে সে মুসলিমদের ইজমা অনুযায়ী কাফির।" [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৯]

২।"যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।" [সূরা আল আনা'ম, ১২১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফিয ইবন কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ যদি তুমি আল্লাহর বিধান ও তাঁর শারীয়াহকে ত্যাগ করে অন্য কারও বক্তব্য (বিধান, আইন, সংবিধান) গ্রহণ কর, তবে জেনে রাখ, এটাই প্রকৃত শিরক। কারণ আল্লাহ্ বলেছেনঃ

তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে আল্লাহ ব্যতীত তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল। [সূরা আত-তাওবাহ, ৩১]

ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসির করেছেন আদি ইবন হাতিম তাই রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ঘটনার সাহায্যে। আদি ইবন হাতিম তাই রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু –এর সামনে এই আয়াত পড়া হলে তিনি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছিলেন – "হে রাসূলুল্লাহ! ইহুদী-খ্রিষ্টানরা তো তাদের আলেম ও দরবেশদের ইবাদাত করতো না।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেনঃ "হ্যাঁ, অবশ্যই তারা তা করেছে। তারা তাদের আলেম ও দরবেশদের হারামকৃত বিষয়কে হারাম বলে মেনে নেয় এবং হালালকৃত বিষয়কে হালাল বলে স্বীকার করে নেয়। এই হচ্ছে তাদের(পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগ) উপাসনা করা।"[তাফসীর আল ক্বুরআন আল-আযীম, খণ্ড ২, সূরা তাওবাহ ৩১ নং আয়াতের তাফসীর]

অর্থাৎ ইহুদী-খ্রিষ্টানদের জন্য আল্লাহ্ যা হারাম করেছিলেন, আলেম ও দরবেশগণ তা হালাল সাব্যস্ত করেছিল এবং ইহুদী-খ্রিষ্টানরা তাদের 'আলেম-দরবেশদের আনুগত্য করে, তা হালাল হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আর আল্লাহ্ যা তাদের জন্য হালাল করেছিলেন, তা আলেম ও দরবেশগণ হারাম সাব্যস্ত করেছিল, এবং ইহুদী-খ্রিষ্টানরা তাদের 'আলেম-দরবেশদের আনুগত্য করে, তা হারাম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আর এটাই আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করা – এই হল আল্লাহর রাসূল ﷺ – যার উপর ক্বুর'আন নাযিল করা হয়েছে, এবং যার কাছে সাত আসমানের উপর থেকে ওয়াহী আসতো, তাঁর ﷺ মত।

বাদরুদ্দীন আইনীঃ

বাদরুদ্দীন আইনী রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ

যে নাবীদের শারীয়াহ বদলে নিজের শারীয়াহ তৈরি করলো, তার শারীয়াহ বাতিল। আর এ ধরনের লোকের অনুসরন হারাম।

"তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? যদি চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় যালিমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" [আশ-শুরা, ২১]

এ কারণে ইহুদী এবং নাসারারা কাফিরে পরিণত হয়েছিল। তারা বিকৃত শারীয়াহ আঁকড়ে ধরেছিল আর আল্লাহ্   মানবজাতির উপর বাধ্যতামূলক করেছেন মুহাম্মাদ ﷺ এর শারীয়াহর অনুসরণ করা।[উমদাতুল ক্বারী, খন্ড ২৪, পৃঃ ৮১]

শাইখ আব্দুল লতিফ ইবন আব্দুর রাহমানঃ

শাইখ রাহিমাহুল্লাহকে বেদুঈনদের পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি, আচার-প্রথার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যেগুলো তখনো বেদুঈনদের মাঝে চালু ছিল। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিলে- যারা এসব রীতিনীতি ও আচার-প্রথার ভ্রান্ত হওয়া সম্পর্কে অবগত হবার পরও এগুলোর অনুসরণ করে, তাদের কি কাফির বলা যাবে? তিনি জবাবে বলেছিলেন –

“যে বিচারের ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ ব্যতীত আর কোন কিছুর দ্বারস্থ হয়, এ ব্যাপারে শারীয়াহর বিধান জানা সত্ত্বেও – সে কাফির । আল্লাহ্ বলেন – ‘যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির’।” [আল-মায়’ইদা,৪৪]

এবং আল্লাহ্ আরও বলেন – “তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে?” [আলে-ইমরান, আয়াত ৮৩] [আদ দুরুর আস সানিয়াহ, ৮/২৪১, একই সাথে ৮/২৭১-২৭৫ প্রথম সংস্করণ ১৩৫৬ হিজরিতে প্রকাশিত]

শাইখ মুহাম্মাহ আল-আমিন আশ-শানক্বীতিঃ

আল্লাহ্   র আইন দ্বারা অন্য কোন আইন দিয়ে শাসন করা কুফর এবং শিরক হবার ব্যাপারে আশ-শানক্বীতি বলেন -

“সুস্পষ্ট নুসুস দ্বারা প্রমাণিত সন্দেহাতীত সত্য হল - যারা শয়তানের প্রণীত ও মানুষের মুখ দ্বারা প্রকাশিত মানবরচিত আইনের অনুসরণ করে ঐ আইনের বদলে, যার রচয়িতা হলে আল্লাহ্   এবং যা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রাসূলগণের ﷺ মুখে - তাদের

কুফর এবং শিরকের ব্যাপারে কার কোন সন্দেহ নেই, শুধু ঐ ব্যক্তি ছাড়া যার দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ্ ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং যাকে তিনি ওয়াহীর উজ্জ্বল আলো থেকে বঞ্চিত করেছেন।" [আদওয়া উল বায়ান, খন্ড ৪, পৃঃ ৯০-৯২]

সূরা তাওবাহর ৩১ নম্বর আয়াতের ব্যাপারে তিনি বলেছেন –

"তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে আল্লাহ ব্যতীত তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত ৩১]

"সুতরাং এখানে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, এক্ষেত্রে ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা মুশরিকে পরিণত হয়েছিল, আইনপ্রণেতাদের প্রতি আনুগত্যের কারণে। কারণ আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত, আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে অন্য যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার অনুসরণ হল আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। আর প্রকৃতপক্ষে এসব আইন তৈরিই হয়েছে শয়তানের আনুগত্যের মাধ্যমে, শয়তানের আনুগত্যের জন্য।" [আদওয়া' উল বায়ান তাফসীর ক্বুর'আন বিল ক্বুর'আন, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৫]

"নিশ্চয় শয়তানরা (মনুষ্য জাতির মাঝে)তাদের মিত্রদেরকে প্রত্যাদেশ করে-যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।" [আল-আন'আম,১২১]

এই আয়াতের ব্যাপারে শাইখ বলেছেন-

নিশ্চয় এটা হল সরাসরি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে ফাতাওয়া, আর-রাহমানের শারীয়াহর বিরুদ্ধে গিয়ে যে ব্যক্তি শয়তানের শারীয়াহর অনুসরণ করবে সে মুশরিক, যে আল্লাহ্ র সাথে শিরক করেছে।" [আদ্বওয়া উল বায়ান]

আর এটা হল ফায়সালা তার ব্যাপারে যে ব্যক্তি অন্য শারীয়াহর অনুসরণ করেছে, তবে যে নতুন শারীয়াহ বানিয়ে নেয়, অর্থাৎ আইন প্রণয়নকারীদের ব্যাপারে ফায়সালা কি হতে পারে?

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীমঃ

আল্লাহ্ র আইন ছাড়া অন্য আইন দিয়ে শাসনের ব্যাপারে শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম বলেন -

“এই ধরনের অনেক কোর্টই (যেখানে আল্লাহর শারীয়াহ ব্যতীত কোন বাতিল শারীয়াহ দ্বারা বিচার করা হয়) এখন মুসলিমদের শহরগুলোর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। যেগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুসম্পন্ন। এগুলোর দরজা উন্মুক্ত এবং একের পর এক মানুষ সেখানে ভীড় জমাচ্ছে। তাদের বিচারক তাদের মধ্যে বিচার ফায়সালা করছে যা কিনা কিতাব ও সুন্নাহর সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। ঐ মিথ্যা শারীয়াহর বিচার তাদের মানতে বাধ্য করা হয়। আল্লাহর শারীয়াহ প্রতিস্থাপন করে তাদের উপর এটা আরোপ করা হয়।

তাহলে আর কোন কুফর এই কুফর থেকে বেশি বিস্তৃত ও স্বচ্ছ হবে? এটা মুহাম্মাদ ﷺ যে আল্লাহর রাসূল- এই সাক্ষ্যের বিরোধিতা করার চেয়েও একধাপ বেশি।” [তাহকিম আল ক্বাওয়ানিন, পৃঃ ৭, ১৯৬০ সালে শাইখ এই বক্তব্য দেন**]**

“যখন কোন শাসক কিংবা বিচারক আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করে এবং একথা অস্বীকার করে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এরই শুধুমাত্র অনুসরণ করতে হবে (বিশেষ করে শাসন ও বিচারে)... তবে এটা আল্লাহ্ র নাযিলকৃত শারীয়াহর বিধান অস্বীকার বলে গণ্য হবে – ইবন জারীরও এই মতই দিয়েছেন। এটি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে উলামাগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতি যার ব্যাপারে ঐক্যমত্য রয়েছে - যদি কেউ দ্বীনের কোন মূলনীতি অস্বীকার করে, কিংবা ইজমা আছে এমন কোন ক্ষুদ্র বিষয় অস্বীকার করে, কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সন্দেহাতীত ভাবে বর্ণিত কিছু অস্বীকার করে, যদি সে একটি অক্ষরও অস্বীকার করে – তবে সে কাফির, তার কুফর তাকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দিয়েছে।

আর যখন কোন শাসক বা বিচারক স্বীকার করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর বিধান তথা শারীয়াহ সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আল্লাহ্ র আইন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করে এই মনে করে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনীত বিধানবলীর চাইতে অন্য কারো বিচার উত্তম, এবং মানুষের মাঝে বিচার ও মীমাংসার জন্য অধিক প্রযোজ্য – যদি সে এরকম মনে করে পুরোপুরিভাবে অথবা এ অর্থে যে সময়ের পরিক্রমার ফলে পরিস্থিতি এবং অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, যে কারণে অন্য আইন এখন অধিক প্রযোজ্য – তবে এতে কোন সন্দেহ নেই, যে এ হল কুফর। কারণ এর ফলে স্রষ্টার বিধানের উপরে সৃষ্টির বিধানকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সৃষ্টির সস্তা দর্শন এবং চিন্তা প্রক্রিয়ার

মাধ্যমে প্রাপ্ত বিধানকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে আল হাকাম, আল হামীদ আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বিধানের উপরে।" [তাহক্কিম আল ক্বাওয়ানিন, পৃঃ ৫, আরও দেখুন শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যার মাজমু আল ফাতাওয়া ২৭/৫৮]

শাইখ আহমেদ শাকিরের বক্তব্যঃ

"আল্লাহর বিধান ছাড়া শাসন করা নিশ্চিত কুফর এবং এতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলামের অনুসারী কোন ব্যক্তির এই ব্যাপারে কোন প্ররোচনা বা কোন অজুহাতের সুযোগ নেই। সে যেই হোক, ইসলামের উপর তাকে আমল করতে হবে। আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং এটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।" [উমদাহ তাফসীর, আয়াত ৫০, সূরা মায়'ইদা]

'আল্লামা আহমেদ শাকিরের এ ব্যাপারে সুদীর্ঘ বক্তব্য ও বিশ্লেষণ আছে, যার কিছু অংশ পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে।

শাইখ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয বিন বাযঃ

যে শাসক শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে না তার ব্যাপারে শাইখ বিন বাযের বক্তব্যঃ

"...অনুরূপভাবে যে ব্যক্তিই বিশ্বাস করবে যে, আচার, হুদুদ (ইসলামি দণ্ডবিধি)বা এরূপ অন্য কোন বিষয়ে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত শারীয়াহ ছাড়া অন্য কোন আইনে শাসন করা অনুমোদনযোগ্য, সেই (ব্যক্তির এই কাজ) ঈমান বিনষ্টকারী (নাওয়াক্বিদুল ঈমান) চতুর্থ বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে। এমনকি, যদি এটাকে শারীয়াহর চেয়ে উত্তম বলে বিশ্বাস নাও করে, তথাপিও অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, এর অনুমতি দান করে সে আল্লাহর ঘোষিত নিষিদ্ধ কাজকে বৈধ করেছে। আর ব্যভিচার, মদ, সুদ, এবং আল্লাহর শারীয়াহ ব্যতীত অন্য আইনে শাসন করার মতো ধর্মের নিষিদ্ধ জিনিসকে যে সিদ্ধ (হালাল বা বৈধতা প্রদান) করবে, মুসলিমদের ইজমা অনুযায়ী সে কাফির।" [দাওয়াহ, গবেষণা ও ইফতা, সাউদি আরবের সাধারন পরিষদ কতৃক প্রচারিত The Islamic Research Magazine, ইস্যু নং- ৭, পৃষ্ঠা-১৭,১৮]

শায়খ বিন বায রাহিমাহুল্লাহ তার "আরব জাতীয়তাবাদের সমালোচনা" [Naqd al-Qawmiyyah al-'Arabiyyah 'ala Daw' al-

Islam wa'l-Waaqi'] নামক রচনায় (পৃষ্ঠা ৫০) মানব রচিত আইনের শাসনের বর্ণনায় লিখেছেন – "এটা হচ্ছে বিরাট দুষ্কৃতি, সুস্পষ্ট কুফর এবং ধর্মত্যাগের ঘোষণা(রিদ্দা)।"

"আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে যে শাসন করে, এই ভেবে যে তার এই নিয়ম আল্লাহ্ র নাযিলকৃত নিয়মের চেয়ে উত্তম, সে সকল মুসলিমের মতে কাফির। একই ভাবে যে আল্লাহর আইন ব্যতীত মানবরচিত আইন দিয়ে শাসন করে এবং মনে করে এটা (মানবরচিত আইন দিয়ে শাসন) জায়েজ – সেও কাফির। যদি সে বলে, 'মানবরচিত আইন অপেক্ষা শারীয়াহ দিয়ে শাসন করা উত্তম' – তাও সে কাফির। সে কাফির কারণ, আল্লাহ্ যা নিষিদ্ধ করছে, সে তা জায়েজ গণ্য করছে।" [মাজমু'আ ফাতাওয়া ইবন বায, ৪/৪১৬**]**

শাইখ ইবন উসাইমীনঃ

যে শাসক ইসলামী শারীয়াহ ব্যতীত অন্য কোন আইন দ্বারা শাসন করে তার কাফির হওয়া সম্পর্কে শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন উসাইমান রাহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্যঃ

"যে শাসকরা ইসলামী শারীয়াহ ব্যতীত অন্য কোন আইন দ্বারা শাসন করে তারা এসব আইনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ দ্বীনকেই প্রতিস্থাপিত করে নেয়। যারা এরকম করে তারা কুফর করেছে যদিও তারা সালাহ আদায় করে, সিয়াম পালন করে, যাকাত দান করে এবং হাজ্জ পালন করে। এরা হল কাফির কারণ তারা জানে তারা যে আইন দ্বারা শাসন করে তা আল্লাহর আইন না, এবং তারা আল্লাহর আইন থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

তারপর তিনি সূরা নিসা-র নিম্নোক্ত আয়াহটি দালীল হিসেবে উপস্থাপন করেন-

"অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে [মুহাম্মাদ ﷺ] ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।" [সূরা নিসা, ৬৫[

অতঃপর শাইখ বলেন-

তাই অবাক হবেন না যখন আমরা এরকম শাসককে কাফির বলবো যদিও তারা সালাহ আদায় করে, সিয়াম পালন করে, যাকাত দান করে এবং হাজ্জ পালন করে। কারণ যারা কিতাবের (কুর'আন) কিছু অংশে অবিশ্বাস করলো, তারা সম্পূর্ণ কিতাবকেই অবিশ্বাস করলো। আল্লাহর আইন থেকে যা নিজের পছন্দ হচ্ছে সেটা গ্রহণ করা আর যা পছন্দ হচ্ছে না তা বর্জন করা - এরকম করার কোন অবকাশ নেই। এরকম করা হল আল-কুফর। এবং যে এরকম করলো সে নিজের খেয়াল খুশীকে অনুসরণ করলো এবং নিজের খেয়াল খুশিকে নিজের রাব্ব হিসেবে গ্রহণ করলো [আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? -সূরা আল জাসিয়া, ২৩ নম্বর আয়াত]।

...আজকের কথিত মুসলিম শাসকরা, আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর শারীয়াহকে এমন আইনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেছে যা সরাসরি আল্লাহর আইনের বিরোধি। তারা আল্লাহর আইনের পরিবর্তে আল্লাহর শত্রুর আইন গ্রহণ করেছে। আল্লাহর শত্রুর দ্বারাই এসব আইনের পত্তন হয়েছিল, আর তারপর লোকেরা এসব আইনের অনুসরণ করেছিল।

অদ্ভুত ব্যাপার হল, লোকেদের ‘ইলমের অগভীরতা আর দ্বীনের ব্যাপারে দুর্বলতার কারণে আমরা দেখতে পাই, যদিও তারা জানে এসব আইন (গণতন্ত্র, আধুনিক সংবিধানের ধারণা) তৈরি হয়েছিল কিছু মানুষের দ্বারা কয়েকশো বছর আগে, মুসলিম উম্মাহর থেকে অনেক দূরবর্তী অন্য এক মহাদেশে অন্য জাতিদের জন্য, তথাপি তারা এসব আইনকে মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, অথচ এসব আইন ও বিধান মুসলিমদের জন্য একেবারেই উপযুক্ত না। এদের ইসলাম কোথায়? এদের ঈমান কোথায়? নবী মুহাম্মাদের ﷺ আনীত দ্বীনের ব্যাপারে নিশ্চয়তা কোথায়? তাঁকে ﷺ প্রেরণ করা হয়েছিল সমগ্র মানবজাতির প্রতি রাসূল হিসেবে। আর তাঁর ﷺ রিসালাহ, তাঁর ﷺ আনীত দ্বীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মানবজাতির সকল বিষয়।

অনেক অজ্ঞ-জাহেল লোকেরা বলে শারীয়াহ হল শুধুমাত্র ইবাদাত, ব্যক্তিগত জীবন, বিয়ে আর উত্তরাধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে। কিন্তু তারা ভুলে যায় শারীয়াহ হল সব কিছুর জন্য। যদি আপনি এর প্রমাণ চান তবে ক্কুর’আনের সবচেয়ে লম্বা আয়াতগুলো খুঁজে বের করুন, দেখবেন এগুলো হলো লেনদেন সংক্রান্ত [মুওয়ামালাত]। তাহলে কিভাবে কেউ বলতে পারে আল্লাহ-র শারীয়াহ হল শুধু ইবাদাত ও ব্যক্তিগত জীবনের জন্য? এটা তো অজ্ঞতা ও গোমরাহি!...

তিনটি শর্ত পূরণ করা ব্যতীত কেউ বিশ্বাসী হতে পারবে নাঃ

১) সে সকল বিষয় আল্লাহর রাসূল ﷺ কে (অর্থাৎ তাঁর ﷺ আনীত শারীয়াহ, ক্বুর'আন ও সুন্নাহকে) বিচারক হিসেবে মেনে নেবে

২) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সিদ্ধান্ত ও বিচারের ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ থাকতে পারবে না

৩) সে সম্পূর্ণ ভাবে এর প্রতি (দ্বীন ইসলাম, আল্লাহ-র শারীয়াহ) আত্মসমর্পণ করবে যাতে সে হিদায়েত লাভ করতে পারে।

এ তিনটি শর্ত পূরণ হলে ব্যক্তি বিশ্বাসী হতে পারবে। অন্যথায় সে ঈমানহারা হবে অথবা তার ঈমান অপূর্ণ থাকবে।"[ইংরেশাইখেবটাইটেল সহ বক্তব্যের ইউটিউব লিঙ্ক- [https://www.youtube.com/watch?v=JgKdU3tlqLI]

শাইখ আবদুল রাযযাক 'আফিফিঃ

সংসদ/আইনসভা, সংবিধান এবং এর দ্বারা শাসনের ব্যাপারে শাইখের বক্তব্য সুস্পষ্ট -

আল হুকুম বি গাইরি মা আনযালা আল্লাহ্ - শীর্ষক রচনায় সূচনা বক্তব্যের পর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যাতীত অন্য কিছু দিয়ে যারা শাসন করে এবং শাসকদের প্রকারভেদ শাইখ উল্লেখ করেছেন। প্রথম দুটি প্রকার উল্লেখের পর তিনি বলেছেনঃ

"তৃতীয় প্রকারের শাসক হল সেই শাসক যে মুসলিম হবার দাবি করে (অর্থাৎ মুখে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে), এবং শারীয়াহর বিধানবলী সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও সে আইন প্রণয়ন করে এবং বিচার ব্যবস্থা তৈরি করে এবং মানুষকে বাধ্য করে এই ব্যবস্থার অনুসরন করতে, যদিও সে জানে এই বিচার ব্যবস্থা এবং এসব আইন শারীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক। এরকম ব্যক্তি কাফির যে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে গেছে। একই হুকুম তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা বিচার ও আইন প্রণয়নের জন্য

বিভিন্ন সংসদ কিংবা আইনসভা তৈরির নির্দেশ দেয়, এবং লোকেদের আদেশ দেয় এবং বাধ্য করে আইনসভা-সংসদ এবং এদের প্রণীত আইনের অনুসরণের, যদিও তারা জানে এগুলো (এই আইনসভা এবং তাদের প্রণীত আইন) শারীয়াহবিরোধী। একইভাবে যে ব্যক্তি এগুলোর ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিচার করে, এবং প্রয়োগ করে তার ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য। আর যারা এক্ষেত্রে জেনে-বুঝে, স্বেচ্ছায় তাদের আনুগত্য করে এবং আল্লাহর শারীয়াহ ছাড়া এসব আইন দ্বারা বিচার আকাঙ্ক্ষা করে তাদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য। তারা আল্লাহ্‌ র হুকুম, আল্লাহ্‌ র আইন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার দোষে দোষী।"

[শুবাহাত হাওল আস সুন্নাহ এবং আল হুকুম বি গাইরি মা আনযালা, পৃঃ ৬৪,৬৫, দার আল ফাদিলাহ সংস্করণ, প্রকাশিত ১৪১৭]

শাইখ আহমেদ মুসা জিব্রিলঃ

"শাসনের ক্ষেত্রে শিরকের ৫ম উদাহরণ (শাইখ তার বক্তব্যে এর আগে আরও কিছু উদাহরণ তুলে ধরেছেন) হল আল্লাহ-র শারীয়াহ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা শাসন করা। যেমন- যারা প্রকাশ্যে মহিলাদের হিজাব ছাড়া চলাচলকে হালাল করে আইন বানাতে চায়, কিংবা যারা সমাজে সুদকে বৈধতা দিয়ে আইন পাশ করাতে চায়, কিংবা যারা, চার বিয়েকে অবৈধ ঘোষণা করতে চায় (শাইখ উদাহরণগুলোর মাধ্যমে বিশেষভাবে আরব উপদ্বীপের দেশগুলোর দিকে ইঙ্গিত করছেন) – এ রকম যেকোন কিছুর দিকে আহবান করা শিরক আকবর যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। কারণ এধরণের আহবান শুধুমাত্র সে অতর তেকেই নিঃসৃত হতে পারে যা এসব ব্যাপারে আল্লাহ-র বিধানের পরিবর্তে অপর কোন বিধানকে উত্তম মনে করে এবং সেসব বিধান কামনা করে। তার এই মোউখিত আহবানের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে তার এই বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটে। আর এথেকে আল্লাহ-র বিধানসমূহের পরতি ঘৃণাও প্রকাশ পায়। এ হল শিরক আকবর। এরকম আহবান জানানো লোকগুলো বেশিরভাগ সময় মুনাফিক্বও হয়ে থাকে। কারণ আপনি দেখবেন সে আপনার কাছে দাবি করবে সে মুসলিম এবং সে মুসলিম উম্মাহর সমর্থক। আর দেখবেন সে তার জুমু'আর সালত পরার ছবি এনে প্রমাণ দিত চাইবে সে পাক্কা মুসলিম।

যদি কোন মুজতাহিদ (ইজতিহাদের) ভুলবশত এমন বস্তুকে হারাম বলে মত দেন যা আসলে হালাল, কিংবা উল্টোটা, অবে সেটা ভিন্ন বিষয়। একজনন মুজতাহিদ নানা কারণে এমন ভুল করতে পারেন, এবং উলামাগণ এরকম অনেক কারণ লিপিবদ্ধ করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেটা হয়, কোন একটি নির্দিষ্ট হাদীস মুজতাহিদের জানা ছিল না। ইজতিহাদ করার সময় মুজতাহিদ হারাম একটি ব্যাপারকে হালাল মনে করেছিলেন, কারণ ঐ ব্যাপারটি হারাম হওয়া সংক্রান্ত হাদিসটি তিনি জানতেন না। একজন আন্তরিক, সম্মানিত, মুজতাহিদের ভুল শিরক না, কুফর না, এমনকি গুনাহও না। প্রকৃতপক্ষে তিনি এর জন্য পুরষ্কার পাবেন। একটি পুরষ্কার। [আন্তরিক মুজতাহিদ সঠিক ইজতিহাদের জন্য ২টি ও ভুল ইজতিহাদের জন্য ১টি পুরষ্কার পান]। কিন্তু যে ব্যক্তি জেনেশুনে নাবী ﷺ এর পথ ব্যতীত অন্য কিছুর অনুসরণ করে, সে শিরক করলো।

মাজমু'আ ফাতাওয়ার তৃতীয় খন্ডে ইবন তাইমিয়্যা বলেছেন, যখন কেউ হালালকে হারাম করে, কিংবা উল্টোটা করে, কিংবা আল্লাহ্র শারীয়াহকে প্রতিস্থাপিত করে অন্য কোন শারীয়াহ দ্বারা, তাহলে ফাক্বীহগণের এ ব্যাপারে ইজমা আছে, সে ব্যক্তি হল কাফির। মাজমু'আ ফাতাওয়ার ৩৫তম খন্ডে তিনি এ ধরনের কাজের সাথে জড়িত 'উলামার কথাও বলেছেন। ইবন তাইমিয়্যাহ বলেছেন যখন কোন আলিম ক্বুর'আন ও সুন্নাহর 'ইলম ছেড়ে, এমন কোন শাসকের অনুসরণ করে যে অবস্থান নেয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ﷺ বিধানসমূহের বিরুদ্ধে – তবে সে 'আলিম দুনিয়াতে এবং আখিরাতে শস্তি পাবার যোগ্য এবং সে মুরতাদ।

ইবন কাসীর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার ১৩ তম খন্ডে বলেছেন, যে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর নাযিলকৃত শারীয়াহ ছেড়ে অন্য কোন শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে সে কাফির। ইবন কাসিরের একথার অর্থ হল, যদি কেউ ক্বুর'আন ও সুন্নাহ ছেড়ে তাওরাত ও ইঞ্জিল দ্বারা শাসন করে তবে সে কাফির। অতঃপর ইবন কাসির বলেছেন, যদি এটা হয় তাওরাহ এবং ইঞ্জিল দিয়ে শাসনকারীর ব্যাপারে হুকুম – ইঞ্জিল, তাওরাহ তো একটি সময়ে -এগুলো (মানুষকর্তৃক) বিকৃতি সাধনের আগে এবং এগুলো (আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী)রহিত হবার আগে - আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত শারীয়াহ ছিল। যদি এগুলো দ্বারা শাসন করাই আজ কুফর হয়ে থাকে, কারণ এগুলোকে রহিত করা হয়েছে (ক্বুর'আন নাযিলের মাধ্যমের তাহলে চিন্তা করুন যারা অন্য (মানবরচিত) আইন দ্বারা শাসন করে তাদের ব্যাপারে কি হুকুম হবে? যারা এমন করে, তারা ইজমা অনুযায়ী কাফির।

শানক্বিতি আদ্বওয়া আল বাইয়্যানে এ ব্যাপারে কিছু দালীল পেশ করার পর বলেছেন – যারাই কোন মানবরচিত বিধানের অনুসরণ করবে – এ অসাধারণ উক্তিটির দিকে লক্ষ্য করুন – যে ব্যক্তিই শয়তানদের দ্বারা রচিত হবার পর মানুষের মুখ হতে নিঃসৃত, মানবরচিত বিধানের অনুসরণ করবে ঐ শারীয়াহকে বাদ দিয়ে যার রচয়িতা আল্লাহ্ এবং যা রাসূলুল্লাহ ﷺ মুখে প্রকাশ পেয়েছে – কোন সন্দেহ নেই সে হল কাফির এবং মুশরিক। আর এ ব্যাপারে শুধু সে ব্যক্তিই সন্দিহান হবে আল্লাহ্ যার দৃষ্টিশক্তি ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং ওয়াহীর উজ্জল আলোর প্রতি তাকে অন্ধ করে দিয়েছেন।

ইমাম শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহিম সূরা নিসার এই আয়াতের উল্লেখ করেছেন - "অতএব, আপনার রাব্বের কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক বলে গ্রহণ না করে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।" [আন-নিসা, ৬৫]

এবং তারপর (এ আয়াতের ব্যাপারে) মন্তব্য করেছেন যারা নাবী ﷺ কে ছাড়া অন্য কাউকে নিজের বিবাদ-মোকদ্দমার ব্যাপারে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাদের ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ হল কসমের সাথে প্রত্যাখ্যান।

[https://www.youtube.com/watch?v=dbhr6vwcxnQ]

শাইখ সুলাইমান বিন নাসির আল 'উলওয়ান

আত-তাওহীদে অর্থ হল শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদাত করা। যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে সে শিরক এবং মুশরিকদের প্রতি বারা'আ [বিদ্বেষ, শত্রুতা, সম্পর্কছিন্নতা, ঘৃণা] প্রদর্শন করে। আর যে শিরক ও মুশরিকদের প্রতি বারা'আ প্রদর্শন করে না সে মুসলিম হতে পারে না।

"ইমান বিধ্বংসী ১০টি বিষয়" – এ শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, এই দশটি বিষয়ের একটি হলঃ যে ব্যক্তি কাফির আসলি [অর্থাৎ ক্বুর'আনে যাদের কাফির বলা হয়েছে] ও মুশরিকদের কুফফার ঘোষণা করে না, কিংবা তাদের কুফরের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে সে নিজেও কাফির।

তাই ইহুদী, খ্রিষ্টান ও মুশরিকরা যে কুফর করেছে আমরা তা বিশ্বাস করি। একারণে তাদের প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা, শত্রুতা পোষন করি ও প্রদর্শন করি। কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন-

"অতঃপর তিনি (ইব্রাহীম) যখন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করত, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করলেন..." [সূরা মারইয়াম, ৪৯]

"তোমরা যখন তাদের থেকে পৃথক হলে এবং (পৃথক হলে) তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয়গ্রহণ কর।" [আল-কাহফ, ১৬]

"আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর তাদেরকে; আমি আমার পালনকর্তার ইবাদত করব।" [সূরা মারইয়াম, ৪৮]

“তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে।” [আল মুমতাহানা, ৪]

এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেনঃ

“..তিনি নিজ হুকুম ও বিধানের [ফী হুকমিহি] কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না।” [আল-কাহফ, ২৬]

অতএব শিরক এবং মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, নিজেদের দূরে সরিয়ে নেওয়া আমাদের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব। আর ভাববেন না শুধুমাত্র মাযার পূজা, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো প্রতি প্রার্থনা করা, কিংবা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের কাছে সাহায্য, ক্ষমা, চিকিৎসা ইত্যাদি চাওয়ার মাধ্যমেই শুধু আপনি শিরকে পতিত হতে পারেন । অবশ্যই এ সবগুলোই শিরক, এবং এগুলোর শিরক হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, তবে এগুলো ছাড়াও অন্যান্য ধরণের শিরক আছে। যেমন শিরক আল-মাহাব্বা [আল্লাহ্ ব্যাতীত অপরকে ভালোবাসার মাধ্যমে শিরক], শিরক আত-ত্বা'আ [আল্লাহ্ ব্যাতীত অপরের আদেশের অনুসরণ ও আনুগত্যের শিরক] এবং আল্লাহ যা নাযিল করেছে তদানুযায়ী শাসন না করার শিরক, কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন -

“..তিনি নিজ হুকুম ও বিধানের [ফী হুকমিহি] কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না।” [আল-কাহফ, ২৬]

সুতরাং যে অভিশপ্ত মানবরচিত আইন দ্বারা শাসন করে, সে মুশরিক এবং কাফির। আল্লাহ্ 'আযযা ওয়া জাল বলেছেন –

“... আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।” [আল আন'আম, ৪০]

যার অর্থ, আল্লাহ্ ব্যাতীত আর কারো আইন প্রণয়নের অধিকার নেই। আল্লাহ্ আরও বলেনঃ

“…যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।” [আল মায়ইদা, ৪৪]

অতএব এসব মুশার’ইনদের (মিথ্যা আইনপ্রনেতা) উপর অবিশ্বাস করা, তাদের প্রত্যাখ্যান করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন-

“যদি কেউ কোন হারাম বস্তুকে – যা হারাম হবার ব্যাপারে ঐক্যমত আছে- হালাল সাব্যস্ত করে, কিংবা হালাল বস্তুকে – যা হালাল হবার ব্যাপারে ঐক্যমত আছে- হারাম সাব্যস্ত করে, তবে ফাক্বীহগণের ইজমা অনুসারে কাফির।” [মাজমু’ আল-ফাতাওয়া, ৩/২৬৭]

এবং আল-ইমাম ইবন হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন-

যে বিষয় ক্বুর’আনের কোন আয়াত বা হাদীস নেই, এমন বিষয়েও যদি কেউ তাওরাত কিংবা ইঞ্জিল দ্বারা বিচার করে, তবে সে একজন কাফির-মুশরিক, ইসলামে যার জন্য কোন জায়গা নেই। আর এ ব্যাপারে ফাক্বীহগণের ইজমা আছে।” [ইহকাম আল-আহকাম ফি উসুল আল-আহকাম, ৫/১৫৩]

সুবহান’আল্লাহ্! আল-ইমাম ইবন হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলছেন ফাক্বীহগণ এ বিষয়ে একমত, যদি কেউ প্রকৃত (অবিকৃত) তাওরাত অথবা ইঞ্জিল দিয়েও শাসন করে তবে সে কাফির। (কারণ কিতাবগুলো শুধুমাত্র বানী-ইসরাইলের জন্য নাযিল করা হয়েছিল) তবে আজকের শাসকদের ব্যাপারে হুকুম কি হবে, যারা শাসন করছে ইহুদী-নাসারা আর সেইসব অভিশপ্ত নাস্তিক, গণতান্ত্রিক আর সেক্যুলারিস্টদের আইন দিয়ে, যারা ইবলিসের চাইতেও বড় কাফির?

ইবন হাযম বলছেন যে ব্যাক্তি ক্বুর’আন ছেড়ে অবিকৃত তাওরাহ আর ইঞ্জিল দিয়ে শাসন করবে তার কাফির হবার ব্যাপারে ফাকীহগণের ‘ইজমা আছে। আর যারা বুশের নীতি, আর অভিশপ্ত ন্যাটো আর জাতিসংঘের আইন আর নীতি দিয়ে শাসন করছে তারা কাফির না?

সুবহান'আল্লাহ্, "তোমাদের কি হল? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ?" [আল-ক্বালাম, ৩৬]

আমাদের সময়ে এই গোমরাহির (অর্থাৎ যে আল্লাহর আইন দ্বারা শাসন করে না, তাকে কাফির মনে না করা) ব্যাপক প্রচার পেয়েছে। আজকের স্বঘোষিত সালাফিদের মধ্যে 'ইরজা আছে। এরা হল ইরজা'র সালাফ। এরা হল এমন সব লোক, সত্যকে বিলম্বিত করার ব্যাপারে যাদের রয়েছে ব্যাপক প্রেরণা ও উদ্দীপনা। আর তাই তারা বলে "এ হল কুফর দুনা কুফর।" [অর্থাৎ আজকের স্বঘোষিত ইরজাসম্পন্ন 'সালাফি'রা বলেন আল্লাহর আইন দ্বারা শাসন না করা হল, "কুফর দুনা কুফর"। কুফর দুনা কুফর হল এমন কুফর যে কুফর করলেও ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয় না।]

এ হল সুস্পষ্ট গোমরাহি এবং বিচ্যুতি!

এটা কুফর আকবর! যদি ব্যক্তি শারীয়াহর কিছু অংশ বাদ দেয়, কিংবা সম্পূর্ণ শারীয়াহ বাস্তবায়ন না করে, তবে একে কুফর আকবার [যে কুফর ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়] বলা হয়।

আর একারণেই আল-হাফিয ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ তার আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবে গেঙ্গিস খান এবং যারা তাতারীদের আল ইয়াসিক কিতাব দিয়ে লিখতো তাদের সম্পর্কে লিখেছেন-

"অতএব কেউ যদি খাতুমুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ﷺ এর উপর নাযিলকৃত শারীয়াহ ছেড়ে, পূর্বে নাযিলকৃত অন্য কোন শারীয়াহ দ্বারা বিচার করে ও শাসনকার্য চালায়, যা রহিত হয়ে গেছে, তবে সে কাফির হয়ে গেছে। তবে (চিন্তা করুন) সেই ব্যক্তির অবস্থা কি রূপ যে আল-ইয়াসিক্কের ভিত্তিতে শাসন করে এবং একে ইসলামী শারীয়াহ'র উপর স্থান দেয়? এরকম যেই করবে সে মুসলিমদের ইজমা অনুযায়ী কাফির।" [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃঃ ১১৮-১১৯]

আমাদের সামনে উলামাগনের ইজমা আছে, আমাদের সামনে এই ইজমার ব্যাপারে ইবন হাযম রাহিমাহুল্লাহর সাক্ষ্য আছে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এবং আল হাফিয ইবন কাসিরের রাহিমাহুল্লাহ সাক্ষ্য আছে – আর এর বাইরে কি আছে [অর্থাৎ উলামাগনের ইজমা আছে, এবং ইজমা থাকার ব্যাপারে মহান উলামাগনের সাক্ষ্য আছে, তাহলে কিসে তোমাদের এ ব্যাপারে সত্য বলা থেকে বাধা দিচ্ছে?]?

কি তোমাদের বাধা দিচ্ছে? তোমাদের বাধা দিচ্ছে গোমরাহি, বিচ্যুতি, ইরজা, আর আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ নিয়ে খেলতামাশা।

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুঃ

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন-

“রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন এটা (তিনি তার তরবারীর দিকে ইঙ্গিত করলেন) দিয়ে আঘাত করতে, তাদেরকে যারা ওটা (তিনি ক্বুর'আনের দিকে ইঙ্গিত করলেন) ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।” [মুসনাদ আহমাদ, ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ মাজমু' ফাতাওয়ার ৩৫তম খন্ডে এটি উল্লেখ করেছেন]

সায়্যেদিনা ইবন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুঃ

একদা ইবন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে রিশওয়া (ঘুষ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি বলেন-

“এটা হচ্ছে সুহত (অবৈধ সম্পদ)।”

তখন আবারো জিজ্ঞেস করা হয়, “না, আমরা বিচার ফায়সালার ব্যাপারে বলছি।”[অর্থাৎ প্রশ্ন নিছক ঘুষ গ্রহণ করার ব্যাপারে না, ঘুষের বিনিময়ে বিচার বদলে দেয়ার ব্যাপারে]

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেনঃ “এটাই হচ্ছে কুফর।” [তাফসীর ইবন কাসীর এবং আকবার আল-ক্বাদা]

সাইয়্যিদিনা ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুঃ

১।হাসান ইবনে আবি আর রাবিয়া আল জুরজানি [পূর্ণ নাম হল, ইবন ইয়াহইয়া ইবন জা'জ। ইনিও বর্ণনাকারী হিসেবে সত্যবাদী এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে গৃহীত] বর্ণনা করেছেন, আমরা আব্দুর রায্‌ যাক থেকে, তিনি মুয়াম্মার থেকে, তিনি ইবনে তাউস থেকে, এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন-

ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করা হল আল্লাহর এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে, "...।আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুসারে যারা বিচার-ফায়সালা করে না, তাঁরাই কাফির।" [আল-মায়'ইদা, ৪৪]

জবাবে ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "কুফরের জন্য এটাই যথেষ্ট।" [আকবার উল কাদ্দাহ, খণ্ড ১, পৃঃ ৪০-৪৫, ইমাম ওয়াকিয়া। বর্ণনাকারী হলেন মুহাম্মাদ ইবন খালাফ ইবন হাইয়্যান, যিনি পরিচিত ওয়াকিয়া নামে। তিনিই আখবার উল ক্বাদা কিতাবটি রচনা করেছেন। ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, আল-খাতিবি এবং ইবন কাসির – তাঁদের সকলের উপর আল্লাহ্‌ রহম করুন – ওয়াকিয়ার ব্যাপারে বলেছেন, "সে বিশ্বাসযোগ্য"।]

যখন ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, "কুফরের জন্য এটাই যথেষ্ট", তখন আর এটাকে ছোট কুফর বলে গণ্য করা যাবে না। যেহেতু তিনি "যথেষ্ট" বলেছেন, তাহলে বোঝা যাচ্ছে তিনি এখানে বড় কুফর (কুফর আকবরকেই) বোঝাচ্ছেন।

২। ইব্রাহীম ইবন আল-হাকাম ইবন যাহির তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বর্ণনা করেছেন আস-সুদ্দাই থেকে যিনি বলেছেন, ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেনঃ

"যে বিচারের ক্ষেত্রে জেনেশুনে স্বেচ্ছাচারিতা করে (অর্থাৎ নিজের ইচ্ছেমতো বিচার করে), জ্ঞান ছাড়া বিচার করে, কিংবা বিচারের ব্যাপারে ঘুষ গ্রহণ করে, সে কাফিরের অন্তর্ভুক্ত।" [আখবার উল ক্বুদা, পৃঃ ৪১]

তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ সংক্রান্ত ক্বুর'আনের কিছু আয়াতের ব্যাখ্যায়

মুফাসসিরিনের বক্তব্য

এখানে আমরা প্রসিদ্ধ মুফাসসিরিনের কিছু বক্তব্য তুলে ধরবো যাতে করে সুনির্দিষ্টভাবে কোন আয়াতসমূহের ভিত্তিতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর অতীত ও বর্তমানের উলামাগন এ ঐক্যমতে উপনীত হয়েছেন তা সম্পর্কে একটি ধারণা পাঠক পেতে পারেন। তবে এক্ষেত্রেও মনে রাখা প্রয়োজন এতো অধিক সংখ্য বক্তব্য এ বিষয়ে আছে, যে তার সবগুলো একত্রিত করা দুঃসাধ্য। আশা করা যায় এখানে যা উদ্ধৃত হয়েছে পাঠক তা থেকে মোটামুটি একটি ধারণা পাবেন।

আল মায়'ইদা ৪৪ নম্বর আয়াতঃ

"আমি তওরাত অবতীর্ন করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে এ ইলাহী গ্রন্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্যে গ্রহণ করো না, যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মুফাসসিরিনের বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হল -

১। ইব্রাহিম আন-নাখায়ী

যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।

এই আয়াতের ব্যাপারে ইব্রাহিম আন-নাখায়ী বলেছেনঃ এই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল বানী ইস্রাইলের ব্যাপারে, আর আল্লাহ্ এই উম্মাহকেও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন (অর্থাৎ এই আয়াত এই উম্মাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য)।" [তাফসীর আব্দুর রাযযাক, ১/১৯১, আত-তাবারী, ১০/৩৫৬-৩৫৭, বর্ণনা নম্বর – ১২০৫৮, ১২০৫৯; আদ-দুর আল-মানছুর, ৩/৮৭, দার আল-ফিকর সংস্করণ]

২।আল-হাসান আল-বাসরী

আল-হাসান এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছেনঃ “এই আয়াত নাযিল হয়েছিল ইয়াহুদিদের ব্যাপারে এবং এর হুকুম আমাদের জন্যও প্রযোজ্য।” [আত-তাবারি, ১০/৩৫৭, বর্ণনা নম্বর. ১২০৬০, আদ-দুর আল মানছুর, ৩/৮৮]

৩। ইবন মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

সাহাবাদের মধ্যে ইবন মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা আছে যা দ্বারা বোঝা যায়, এই আয়াতের হুকুম সাধারণভাবে সকলের উপর প্রযোজ্য [শুধুমাত্র বানী ইসরাইলের ক্ষেত্রে না]। ইলক্বিমা এবং মাসরুক্ব থেকে বর্ণিত – “তারা ইবন মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ঘুষের ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন। জবাবে ইবন মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘এটি হারাম বস্তু সমূহের অন্তর্ভুক্ত’ [আল মায়’ইদা, ৬২-৬৩]। তারা তখন প্রশ্ন করলেন যখন বিচারককে ঘুষ দেওয়া হয় (বিচারের রায় পরিবর্তন করার জন্য)। ইবন মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন- ‘এটা কুফর’। তারপর তিনি এই আয়াতটি পড়লেনঃ ‘যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির’।” [আত-তাবারী, ১০/৩২১। বর্ণনা নম্বর. ১১৯৬০,১১৯৬৩; এবং ১০/৩৫৭, বর্ণনা নম্বর. ১২০৬২]

৪। আস সুদ্দি

আস সুদ্দি বলেছেনঃ “‘যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না’ – (এর অর্থ) আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী যে শাসন করে না, এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তা ত্যাগ করে, এবং সজ্ঞানে শারীয়াহ ব্যতীত অন্যকিছু দ্বারা বিচার করে, সে কাফিরদের একজন।” [আত-তাবারী, ১০/৩৫৭, বর্ণনা নম্বর. ১২০৬২]

৫।আল যাজ্জাজ

আল যাজ্জাজ বলেছেনঃ “‘যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির’ – এ আয়াতের অর্থ হল যদি কেউ দাবি করে নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) উপর নাযিলকৃত আল্লাহর বিধানবলীর কোন একটি অবৈধ, তবে সে ব্যক্তি কাফির। ফাকীহগণের ঐক্যমত হল, যদি কোন ব্যক্তি বলে বিবাহিত স্বাধীন (অর্থাৎ গোলাম নয় এমন ব্যক্তি) যিনাকারীকে পাথর ছুড়ে হত্যা করার প্রয়োজন নেই - তবে সে কাফির। আর এ কুফর হল নবী ﷺ এর উপর নাযিলকৃত

বিধান অস্বীকারের কুফর। আর যে নবী ﷺ এর উপর অবিশ্বাস করবে সে কাফির।” [মা’আনি আল-ক্বুর’আন ওয়া ই’রাব্বাহু – আল যাজ্জাজ, ২/১৭৮, ‘আলাম আক-কুতুব(বৈরুত) কতৃক প্রকাশিত]

৬। সুফিয়ান আস-সাওরী (রঃ)

সুফিয়ান আস-সাওরী - সূরা মায়’ইদার ৪৪, ৪৫ ও ৪৭ নম্বর আয়াতের ব্যাপারেঃ

আল-‘আল্লামা, আল-ফাক্বিহ, আল-মুফাসসির সুফইয়ান আস-সাওরী আয-যাইদি সূরা মায়’ইদার ৪৪, ৪৫, ও ৪৭ নম্বর আয়াতের ব্যাপারে বলেন-

“প্রথমটি হল এই উম্মাহর জন্য (অর্থাৎ সেসব মুসলিমের জন্য যারা শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে না), দ্বিতীয়টি হল ইহুদিদের জন্য (যারা শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে না), তৃতীয়টি হল নাসারাদের জন্য (যারা শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে না)।” [তাফসীর সুফইয়ান আস-সাওরি এবং আখবারুল-ক্বুদা খন্ড ১, পৃঃ ৪০]

এছাড়া লক্ষ্যনীয় যে শিরক করে এবং কুফরি করে ক্বুর’আনে অনেক জায়গাতে তাদেরকেও যালিম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন- “তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি ? যদি চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় যালিমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।” [আশ-শুরা, ২১]

একারণে সকল মুশরিক ও কাফির মাত্রই যালিম এবং ফাসিক্ব, কিন্তু সকল যালিম ও ফাসিক্ব ব্যক্তিই মুশরিক বা কাফির না। সুতরাং এই তিনটি আয়াতের মধ্যে [আল –মায়’ইদা ৪৪,৪৫,৪৭] কোন সংঘর্ষ নেই। আল্লাহ্‌ র শারীয়াহ দ্বারা শাসন না করা ব্যক্তি যালিম, ফাসিক্ব এবং কাফির।

৭। আল-কুরতুবী

আল আল্লামা ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

“আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী যে শাসন করে না, এবং সে এর মাধ্যমে ক্বুর'আনকে অস্বীকার (জুহুদ) ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান (রাদ্দ) করে, সে কাফির। এটাই হল ইবন আব্বাস এবং মুজাহিদের বক্তব্য, যে এই আয়াত (আল-মায়'ইদা ৪৪) ‘আম ভাবে প্রযোজ্য। ইবন মাসুদ এবং আল-হাসানও বলেছেন ‘এই আয়াত ‘আমভাবে সবার উপর প্রযোজ্য যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী শাসন করে না – হোক তারা মুসলিম, ইহুদি, কিংবা অন্য কোন ধরনের কুফফার।'”
[জামি উল-আহকাম ফিল-ক্বুর'আন, খন্ড ৫, পৃঃ ১৯০]

৮। আবু বাকর আল জাসসাস

“যারা আল্লাহ্ র বিধানাবলী থেকে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশাবলী থেকে কোন কিছু বাদ দেয়, অস্বীকার করে বা প্রত্যাখ্যান করে, তা যত ছোটই হোক না কেন, তাদেরকে এ আয়াতে ইসলাম ত্যাগকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তার এই প্রত্যাখ্যান কোন বিধান তার মনঃপুত না হওয়া, কিংবা (শারীয়াহর পরতি) বিদ্বেষ কিংবা কোন বিধান মেনে নিতে অনিচ্ছা - যে কারণেই হোক না কেন, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। যাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইনের অবস্থানের সাথে এই অবস্থানই সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম শুধুমাত্র যাকাত অস্বীকারকারীদের মুরতাদ ঘোষণা করেই থেমে থাকেন নি, বরং তাদেরকে হত্যা করেছেন এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের গানীমাহ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এর কারণ হল, আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন যে যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিচার (হুকুম) ও শাসনের [অর্থাৎ শারীয়াহর শাসন] অনুসরণ করে না, তারা আহলুল ঈমানের (বিশ্বাসীদের) অন্তর্ভুক্ত না (অর্থাৎ তারা কাফির)।” [আহকাম উল ক্বুরআন, খন্ড ৩, পৃঃ ১৮১]

৯। শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব

আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যাতীত অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা ব্যক্তি যে তাগুত ও কাফির তা উপস্থাপনের জন্য শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব সূরা মায়'ইদার ৪৪ নম্বর আয়াত ব্যবহার করেছেন -

“তৃতীয় প্রকারের তাগুত হল সে ব্যক্তি যে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসন করে। আর এর

দালীল হল আল্লাহ্‌ ‘আযযা ওয়া জাল এর এই আয়াতঃ আল মায়’ইদা ৪৪” [আদ-দারার উস সুন্নিয়্যাহ ফিল আজ্বাবাত উন-নাজদিয়্যাহ, খন্ড ১, পৃঃ ১০৯-১১০]

আলে ইমরান, আয়াত ৬৪:

বলুনঃ হে আহলে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস-যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান-যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, ˜সাক্ষী থাক আমরা তো মুসলিম/আত্বসমর্পনকারী।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ‘মুফাসসিরিনগণ তুলে ধরেছেন আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে হালাল-হারাম নির্ধারনকারী (আইনপ্রণেতা/বিধানদাতা) হিসেবে গ্রহণ করা কুফর ও শিরক ।

১। আল কুরতুবি

কুরতুবি বলেন – “‘…এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে রাব্ব হিসেবে গ্রহণ করবো না’ (আলে ইমরান, ৬৪) – এই আয়াতে “রাব্ব হিসেবে গ্রহণ না করার” অর্থ হল আল্লাহ্‌ যা হালাল করেছেন এটা ছাড়া আর কিছু হালাল বা হারাম (বৈধ ও অবৈধ) করার ব্যাপারে আমরা আর কারো অনুসরণ করবো না। এটি এই আয়াতের অনুরূপ – ‘ইহুদী ও নাসারারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত…’ (আত তাওবাহ, ৩১) – যার অর্থ হল আল্লাহ্‌ যা হারাম ও হালাল করে নি, পন্ডিত ও সংসারবিরাগীদিগ তা হালাল ও হারাম করেছিল আর ইহুদী-নাসারারা এতে তাদের অনুসরণ করেছিল- এর এই অনুসরণের মাধ্যমে তারা পন্ডিত ও সংসারবিরাগীদিগকে আল্লাহ্‌ ব্যাতীত রাব্ব হিসেবে গ্রহণ করেছিল।”[তাফসীর আল কুরতুবি, ৪/১০৬]

২। ইবন হাযম

ইবন হাযম এ ব্যাপারে উত্থাপিত একটি আপত্তি উল্লেখ করে তার জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, "কেউ যদি বলে, ইহুদী আর নাসারারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে রাব্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে এটা কিভাবে হতে পারে, যখন তারা (ইহুদী ও নাসারা) এ কথা অস্বীকার করছে?" [অর্থাৎ, যেহেতু তারা মুখে বলছে তারা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে রাব্ব হিসেবে গ্রহণ করে না, তাহলে কিভাবে তাদের ব্যাপারে এটা বলা যায় যে তারা এটা করছে?] এর জবাবে আমরা বলি – আল্লাহ সকল শক্তির উৎস, বস্তুসমূহের নামকরণ এবং প্রকারভেদ সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ র নিয়ন্ত্রণাধীন এবং তাঁর এখতিয়ারভুক্ত। যখন ইহুদী ও নাসারারা তাদের পন্ডিত ও সংসারবিরাগীদের কতৃক হারামকৃত বিষয়কে হারাম হিসেবে গ্রহণ করলো, এবং তাদের দ্বারা হালালকৃত বিষয়কে হালাল হিসেবে গ্রহণ করলো – তখন বাস্তবিক অর্থে এর মাধ্যমে তারা পন্ডিত ও সংসারবিরাগীদের তাদের রাব্ব হিসেবে গ্রহণ করলো, এবং প্রায়োগিক দিক দিয়ে রাব্ব হিসেবে তাদের ইবাদাত করলো। তাই আল্লাহ্ এ কাজকে "আল্লাহ্ ব্যাতীত অপর কাউকে রাব্ব হিসেবে গ্রহণ করা" – বলে অভিহিত করলেন, এবং এ কাজ নিশ্চিতভাবেই শিরক।" [আল-ফাসল, ইবন হাযম, ৩.২৬৬, সম্পাদিত সংস্করণ]

৩। আত-তাবারী

"...এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে রাব্ব হিসেবে গ্রহণ করবো না" (আলে ইমরান, ৬৪) এ শব্দাবলীর ব্যাপারে আত-তাবারী বলেনঃ

"এখানে আল্লাহর হালালকৃত বিষয়কে হারাম (অবৈধ) এবং আল্লাহ্ হারামকৃত বিষয়কে হালাল (বৈধ) করা নেতাদের আনুগত্য করাকে 'রাব্ব হিসেবে গ্রহণ করা' বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্যতার ব্যাপারে নেতাদের আনুগত্য করা, এবং যা থেকে আল্লাহ্ বিরত থাকতে বলেছেন নেতাদের নির্দেশের কারণে তা থেকে বিরত না থাকাই হল তাদের আল্লাহর পরিবর্তে রাব্ব হিসেবে গ্রহণ করা। যেমন আল্লাহ্ বলেছেনঃ 'ইহুদী ও নাসারারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত...'(আত তাওবাহ, ৩১)" [তাফসীর আত-তাবারী, ৬/৪৮৮, আহমেদ শাকির কতৃক সম্পাদিত]

তিনি আরও বলেন-

আত তাবারী, ইবন জুরাইজ থেকে থেকে বর্ণনা করেছেন - "'...এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে রাব্ব হিসেবে গ্রহণ করবো না', অর্থ হল আমরা একে অপরের আনুগত্যের কারণে আল্লাহর অবাধ্যতা করবো না। এবং নেতা এবং শাসকদের আনুগত্য করা (শারীয়াহর বিরোধিতার ক্ষেত্রে) আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে রাব্ব হিসেবে গ্রহণ করার অর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত –

যদিও এসব শাসকদের ইবাদাত নাও করা হয়, এবং তাদের কাছে দু'আ না-ও করা হয়।" [ইবন আবি হাতিম, জুয আল 'ইমরান, পৃঃ ৩১৮, বর্ণনা নম্বরঃ ৬৯৮]

আন-নিসা, আয়াত ৫১:

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে জিবত ও তাগুতকে এবং কাফিরদেরকে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে।" [আন নিসা, ৫১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরিনের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় আল্লাহ্ ব্যতীত যাকে বিধানদাতা হিসেবে গ্রহণ করা হবে সে তাগুত বলে গণ্য হবে।

১। ইবন সা'দি

ইবন সা'দি 'আল-জিবত' এবং 'আত-তাগুত' সম্পর্কে বলেছেনঃ "এটা হল আল্লাহর ব্যতীত অন্য কিছু বা কোন সত্ত্বার যেকোন ধরনের ইবাদাতে বিশ্বাস কিংবা আল্লাহ- বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা বিচার করা – জাদু, জ্যোতিষী, ভাগ্যগণনা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা এবং শয়তানের আনুগত্য - এসব কিছুই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।"[তাফসীর ইবন সা'দি, ১/৩৫৮]

২। আত-তাবারী

তাগুতের সংজ্ঞার ব্যাপারে আত-তাবারী বলেন,

"আমার মতে তাগুতের সঠিক সংজ্ঞা হল – যা কিছুকে আল্লাহর স্থানে বসানো হয়, এবং আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুর ইবাদাত করা হয়, উপাসনাকারীর নিজ ইচ্ছায় কিংবা যাকে উপাসনা করা হচ্ছে তার জোর জবরদস্তির কারণে, সেটাই তাগুত। যার

উপাসনা করা হচ্ছে সেটা কোন মানুষ হোক, শয়তান হোক, কোন মূর্তি বা পাথর হোক।” [তাফসীর আত-তাবারী, ৫/৪১৯; ৮/৪৬৫]

এটাই তাগুতের সর্বাধিক পরিপূর্ণ সংজ্ঞা। ইমাম মালিকের মতও এটিই, তার মতে আল্লাহ্ ব্যতীত যা কিছুর ইবাদাত করা হয় তাই তাগুত। আল কুরতুবি ও এই মত গ্রহণ করেছেন।

৩। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ

মাজমু' আল ফাতাওয়াতে সূরা মায়'ইদার ৫১ নং আয়াত নিয়ে আলোচনার সময় শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন –

“কাফিরদের বন্ধু/মিত্র হিসেবে গ্রহণ করার একটি বাহ্যিক প্রকাশ হল আল্লাহর কিতাবকে ছেড়ে কাফিরদের কিছু দর্শন, মতাদর্শ গ্রহণ করা ও বিশ্বাস করা কিংবা তাদের আইন দিয়ে শাসন করা।

‘তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে জিবত ও তাগুতকে এবং কাফিরদেরকে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে।’” [আন নিসা, ৫১][মাজমু' আল ফাতাওয়া, খন্ড ২৮, পৃ ১৯১]

সূরা নিসার ৬০ ও ৬১ নং আয়াতঃ

“আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা তাদের মোকদ্দমা তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়....” [আন নিসা, ৬০]

১। আত-তাবারানী

আত-তাবারানী বর্ণনা করেছেন যে ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেনঃ "আবু বারযাহ আল আসলামি ছিল একজন যাদুকর। ইহুদীরা তাদের নানা মোকদ্দমার মীমাংসা তার দ্বারা করিয়ে নিত। একটি ঘটনায় কিছু মুসলিমও তার নিকট দৌড়িয়ে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেনঃ 'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তারা তাদের মোকদ্দমা তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে তাগুতকে প্রত্যাখ্যানের। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের প্রতি এসো, তখন আপনি মুনাফিকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে বিমুখ হয় বিচ্ছিন্ন রয়েছে। অনন্তর তখন কিরূপ হবে- যখন তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদের উপর বিপদ উপনীত হবে? তখন তারা আল্লাহর নামে কসম করতে করতে আপনার দিকে ফিরে আসবে যে, কল্যাণ ও সম্প্রীতি ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।'" [আন-নিসা, ৬০-৬২]

[আত-তাবারানীঃ আল-মু'জাম আল-কাবীর ১১/৩৭৩, হাদীস নম্বর ১২০৪৫। মাজমা' আয-যাওয়া'ইদ, ৭/৬, তিনি বলেন তাবারানী এটা বর্ণনা করেছেন, এবং এর বর্ণনাকারীরা হল আস সাহীহ-এর বর্ণনাকারীরা; আল ওয়াহিদি উল্লেখ করেছেন আসহাব আন-নুযুল, পৃঃ ১৬০ তে (এবং যোগ করেছেন আবু বারযাহ একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন, এবং এই ঘটনা তিনি মুসলিম হবার আগেকার) ফাতহ আল-বারী, ৫/৩৭, প্রথম সালাফিয়্যাহ সংস্করণ।]

২। ইবনুল কাইয়্যিম

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ যা এনেছেন [শারীয়াহ] তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং তার বদলে অন্য কিছু গ্রহণ করাকে আল্লাহ্ এখানে নিফাক্বের মূল নির্যাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।" [মুখতাসার আল সাওয়া'ইক্ব, ২/৩৫৩]

তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদে উল্লেখিত আছে, ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেনঃ "এখান থেকে বোঝা যায় যাকে ক্বুর'আন ও সুন্নাহ দ্বারা বিচারের প্রতি আহবান করা হল, এবং সে এই আহবান প্রত্যাখ্যান করলো, সে মুনাফিক্বদের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতের "ইয়াসুদ্দুন" হল একটি অকর্মক ক্রিয়া (যা এখানে 'বিমুখ হওয়া', 'মুখ ফিরিয়ে নেওয়া' হিসেবে অনূদিত হয়েছে) অর্থাৎ তাদের (শারীয়াহর বিচার থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে বলা হচ্ছে, অন্য কাউকে শারীয়াহ দ্বারা বিচার করা থেকে বিরত রাখার কথা না। যদি শারীয়াহ থেকে নিজে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াকে আল্লাহ্ নিফাক্ব বলে উল্লেখ করেন, তবে যে আরও অগ্রসর হয়ে নিজের কথা, প্রচারণা এবং কিতাবের মাধ্যমে অন্যদেরকেও ক্বুর'আন ও সুন্নাহ দ্বারা শাসন থেকে বিরত রাখতে চায় আর মুখে দাবি করতে থাকে, কল্যাণ এবং সম্মিলন ছাড়া সে আর কিছুই চায় না – এমন লোকের অবস্থা কি হবে? সে কি তার কথা এবং কাজের মাধ্যমে যে তাগুতের প্রতি সে বিচারের দায়িত্ব অর্পণ করে তার সাথে ক্বুর'আন ও সুন্নাহর সম্মিলন চায়?" [তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদ, পৃঃ ৫৫৭]

৩। ইবন কাসীর

ইবন কাসীর এই আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ লোকদের দাবী মিথ্য প্রতিপন্ন করেন যারা মুখে স্বীকার করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার পূর্বের সমস্ত কিতাবের উপর এবং এ কুর'আনের উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। কিন্তু যখন কোন বিবাদের মীমাংসা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তখন তারা ক্কুর'আন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে না, বরং (ক্কুর'আন ও সুন্নাহ অর্থাৎ শারীয়াহ ব্যাতীত) অন্য কিছুর দিকে যায়।

এ আয়াতটি ঐ দুই ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যাদের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখা দিয়েছিল। একজন ছিল ইয়াহূদী এবং অপরজন ছিল আনসারী। ইয়াহূদী আনসারীকে বলেছিলে, চল আমরা মুহাম্মাদ ﷺ –এর নিকট হতে এর মীমাংসা করিয়ে নেবো। আনসারী বলেছিল, চল আমরা কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট যাই।

এও বলা হয়েছে যে, এ আয়াতটি ঐ মুনাফিকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা বাইরে ইসলাম প্রকাশ করতো বটে কিন্তু ভেতরে ভেতরে জাহেলী যুগের বিধানের দিয়ে বিচার করতে চাইতো।

এ ছাড়া এ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অন্যান্য আরও কারণের উল্লেখ রয়েছে।

তবে আয়াতটির একটি 'আম বা সাধারন অর্থ রয়েছে যা 'আম ভাবে প্রযোজ্য। এ আয়াতে ঐ প্রতিটি ব্যক্তির নিন্দা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ-র কিতাব ও রাসূল ﷺ –এর সুন্নাহ দ্বারা বিচার করা থেকে বিরত থাকে এবং অন্য কোন বাতিল বিধানের অনুসারে ফায়সালা গ্রহণ করে। এখানে এটাই হচ্ছে তাগুতের ভাবার্থ [অর্থাৎ এ আয়াতে তাগুত দ্বারা বোঝানো হয়েছে ঐ সবকিছুকে আল্লাহ-র বিধান ব্যাতীত যার বিধান গ্রহণ করা হয়]। এ কারণে আল্লাহ্ বলেছেন- 'অথচ তারা তাদের মোকদ্দমা তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়...'

আল্লাহ্ বলেছেন – "আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদ্দিকে এবং রসূলের প্রতি এসো, তখন আপনি মুনাফিকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে বিমুখ হয় বিচ্ছিন্ন রয়েছে।"

“আপনার কাছ থেকে বিমুখ হয় বিচ্ছিন্ন রয়েছে” অর্থ হল তারা গর্ব ভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, ঠিক একই ভাবে আল্লাহ অন্যত্র মুশরিকদের বর্ণনা দিয়েছেন-

“তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব।” [সূরা লুকমান, ২১]

মু’মিনের উত্তর এটা হতে পারে না। বরং তাদের উত্তর অন্য আয়াতে নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে-

“অর্থাৎ মুমিনদেরকে যখন তাদের মধ্যে ফায়সালার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করা হয় তখন তাদের এ উত্তরই হয় যে, আমরা শুনলাম ও মানলাম।” [আন নূর, ৫১]

আশ শু’আরা ১০ নম্বর আয়াতঃ

“তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন – ওর মীমাংসাতো আল্লাহ্ রই নিকট। বলঃ ইনিই আল্লাহ্ - আমার প্রতিপালক। আমি নির্ভর করি তাঁর উপর এবং আমি তাঁরই অভিমুখী।” [আশ-শূরা, ১০]

১। ইবন কাসীর

ইবন কাসীর তার তাফসীরে বলেছেনঃ “মুজাহিদসহ একাধিক সালাফ বলেছেন, এর অর্থ হল, বিচারের জন্য আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূল ﷺ এর সুন্নাহর দ্বারস্থ হও। মানুষের মধ্যে উত্থাপিত এবং উত্থাপিত হতে পারে এমন যেকোন মতবিরোধের ব্যাপারে, হোক তা দ্বীনের মূলনীতির সাথে সম্পর্কিত কিংবা ক্ষুদ্র কোন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত, এই হল আল্লাহ্ র নির্দেশ। সব বিষয়ে মীমাংসা এবং হুকুমের ভার ক্বুর’আন এবং সুন্নাহর উপর অর্পণ করতে হবে। আল্লাহ্ বলেছেন –

“তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন – ওর মীমাংসাতো আল্লাহ্ রই নিকট।”

ক্বুর’আন ও সুন্নাহ যে সিদ্ধান্ত দেয় এবং যার সঠিক ও সত্য-হাক্ব হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তা ছাড়া আর যা কিছু আছে তা বাতিল ছাড়া আর কি হতে পারে? তাই আল্লাহ্ বলেছেন – “…তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক।” [আন নিসা, ৫৯]

এ থেকে বোঝা যায়, যে বিবাদপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসার (বিচারের) ভার ক্বুর’আন ও সুন্নাহর (অর্থাৎ শারীয়াহ) প্রতি অর্পণ করে না, সে আল্লাহ্ এবং শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাসী না (অর্থাৎ সে কাফির)।” [তাফসীর ইবন কাসির, ১/৫১৮, আল-ইস্তিক্বামা সংস্করণ]

সূরা বাকারা, ২০৮:

“হে ঈমানদার গন! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।” [আল-বাক্বারা, ২০৮]

১। আত-তাবারী

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উলামাগনের বিভিন্ন মত উল্লেখ করার পর আত-তাবারী বলেনঃ

“যদি প্রশ্ন করা হয়, বিশ্বাসীদের মুহাম্মাদ ﷺ ﷺ –এর অনুসরণ এবং তাঁর ﷺ আনীত দ্বীন ইসলামের অনুসরণের নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ কি বোঝাচ্ছেন? তবে এর জবাব হবে – এর অর্থ হল আল্লাহ্ র সকল বিধান মেনে চলা এবং তাঁর সকল আইন প্রয়োগ করা, এবং এর মধ্যে কিছু গ্রহণ আর কিছু বর্জন না করা। যদি এই অর্থ গ্রহণ করা করা হয়, তবে ‘কাফফাতান’ শব্দটি [এখানে ‘পরিপূর্ণভাবে’ হিসেবে অনূদিত হয়েছে] একটি বিশেষণ যা ইসলামকে নির্দেশ করছে, এবং এখানে এর অর্থ হল – তোমরা যারা মুহাম্মাদ ﷺ ও সে যা এনেছে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছো, তোমরা সম্পূর্ণভাবে ইসলামে

প্রবেশ করো, এবং এর কোন অংশ বাদ দিও না।" [তাফসীর আত-তাবারী, ৪/২৫৫, আহমেদ শাকির কতৃক সম্পাদিত]

সূরা আল কাহফ, ২৬ নম্বর আয়াতঃ

"..তিনি নিজ হুকুম ও বিধানের [ফী হুকমিহি] কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না।" [আল-কাহফ, ২৬]

২। ইবনুল কাইয়্যিম

যদিও কিছু মুফাসসিরিন, যেমন আন-নাসাফি এবং আল-বাইদাউয়ী হুকমিহিকে(এখানে "হুকুম ও বিধান/আইন প্রণয়ন" হিসেবে অনূদিত) ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর বিচার হিসেবে, কিন্তু অধিকাংশই এর ব্যাখ্যাতে দুটো অর্থকেই (অর্থাৎ হুকুম করা এবং আইন প্রণয়ন) গ্রহণ করেছেন (শার এবং ক্বাদর), এবং ইবন কাসির এবং আত-তাবারিও দুটি অর্থই গ্রহণ করেছেন। ইবনুল কাইয়্যিম এবং ইবন সা'দির মতো অনেকেই বলেছেন এর মধ্যে দুটি অর্থই অন্তর্ভুক্ত। [ইবনুল কাইয়্যিম, শিফা আল-'আলিল, পৃঃ ২৮০। ইবন সা'দি, ৫/২৭]

৩। আল শানক্বিতি

"এ আয়াতে এর (হুকমিহী) অর্থের অন্তর্ভুক্ত হল, আল্লাহ্ একমাত্র হুকুমদাতা, যার প্রথম এবং প্রধান অংশ হল তাশরী' (আইন প্রণয়ন)।" [আদওয়া 'আল-বাইয়্যান, ৪/৯০]

আল আন'আম, আয়াত ১১৪ তাফসীরঃ

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

“তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক (হাকাম) অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ন করেছেন?...” [আল আন'আম, ১১৪]

১। ইমাম কুরতুবি

ইমাম কুরতুবি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ “এখানে বলা হচ্ছে, ‘আমি কি আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করবো, যখন তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি তাঁর কিতাবের আয়াতসমূহে বিধানসমূহকে সুস্পষ্ট করেছেন?’ শাব্দিকভাবে ও অর্থের দিক দিয়ে ‘আল-হাকাম’, ‘আল-হাকিম’ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক ও জোরালো। তাই যিনি হাক্ব অনুযায়ী বিচার করেন তিনি ছাড়া আর কেউ হাকাম বলে অভিহিত হবার যোগ্য না। কারণ এটি হল শ্রদ্ধা ও প্রশংসার একটি বিশেষণ। অপর দিকে আল-হাকিম দ্বারা শুধু একটি কাজকে বোঝানো হয়। তাই হাক্ব ব্যাতীত অন্য কিছু দিয়ে বিচার করা ব্যক্তিকেও হাকিম বলে অভিহিত করা যেতে পারে।” [তাফসীর আল-কুরতুবি, ৭/৭০। আরও দেখুন আল-আলুসির রূহ আল-মা'আনি, ৮/৮, দ্বিতীয় সংস্করণ]

সূরা বাক্বারা আয়াত ১৬৬:

“অনুসৃতরা যখন অনুসরণকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক।” [আল বাক্বারা, ১৬৬]

১। আত-তাবারী

এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে যাদেরকে মানুষেরা মহান আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করেছে, যাদের কথা আগের আয়াতে এসেছে “আর মানজাতির মধ্যে এমনো লোক রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে (ইবাদাতের জন্য)...” [আল বাক্বারা, ১৬৫]

যাদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল তারা অনুসরণকারীদের ত্যাগ করবে। এই আয়াতে এ ইঙ্গিত করা হলে, সুদ্দির ব্যাখ্যা সঠিক ছিল যখন তিনি বলেছিলেন, “আর মানজাতির মধ্যে এমনও লোক রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর

সমকক্ষ সাব্যস্ত করে (ইবাদাতের জন্য)…", এখানে সমকক্ষ/সদৃশ (আনদাদ) দ্বারা ঐসব মানুষকে বোঝানো হয়েছে যাদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে লোকে গ্রহণ করেছিল, এবং যখন তারা আদেশ প্রদান করতো তখন লোকেরা তার আনুগত্য করেছিল। আর এদের অনুসরণের মাধ্যমে লোকেরা আল্লাহর অবাধ্যতা করেছিল। অন্যদিকে বিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌ র আনুগত্য করে এবং তাঁকে ছাড়া অন্য সকলের অবাধ্যতা করে। আর এ আয়াতে "অনুসৃতরা যখন অনুসরণকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক।" - শয়তানদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যারা তাদের মনুষ্য অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন/অস্বীকার করবে, এমন ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ এই আয়াতের প্রেক্ষাপট থেকে বোঝা যায় এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে যারা অন্যান্যকে মহান আল্লাহ্‌ র সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে।

[তাফসীর আত-তাবারী, ৩/২৮, আহমেদ শাকির কতৃক সম্পাদিত]

আন-নিসা ১০৫:

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

"নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি তদানুযায়ী মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন ও আদেশ প্রদান করেন, যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষাদান করেছেন…" [আন নিসা, ১০৫]

১। আত-তাবারী

আত-তাবারী বলেছেঃ "'নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি' – অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদ আমি আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি – 'সত্য কিতাব' – অর্থাৎ, কুর'আন – 'যাতে আপনি তদানুযায়ী মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন ও আদেশ প্রদান করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান' – অর্থাৎ এই কিতাবে যা আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন তদানুযায়ী (ফায়সালা করেন ও আদেশ প্রদান করেন)।" [তাফসীর আত-তাবারী, ৯/১৭৫, আহমেদ শাকির কতৃক সম্পাদিত]

২। ইবন 'আতিয়া

ইবন ‘আতিয়া বলেছেনঃ “‘যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষাদান করেছেন’ এর অর্থ হল, (লোকেদের মধ্যে ফায়সালা এবং তাদেরকে আদেশ প্রদান করুন) শারীয়াহর বিধান অনুযায়ী, ওয়াহীর এবং আয়াতসমূহের উপর ভিত্তি করে, এবং ওয়াহীর মূলনীতির আলোকে – আর আল্লাহ্ নাবীদের মাসুম/ভুলমুক্ত করেছেন [অর্থাৎ ওয়াহীর আলোকে নাবীগন যে সিদ্ধান্ত দেন তা কখনো ভুল হবে না, আল্লাহ্ স্বয়ং এটা নিশ্চিত করেছেন]।”[আল মুহাররার আল ওয়াজীয, ৪/২৪৫]

উল্লেখিত আয়াতসমূহ ছাড়াও ক্বুর’আনের অন্যান্য আরও আয়াতেও তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহর বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে এসেছে। এছাড়া যেসব আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেগুলো উল্লেখ করা হয়নি প্রতিটির ক্ষেত্রে বিভিন্ন মুফাসসিরিনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে যার সবগুলো উল্লেখ করা এখানে সম্ভব নয়। তবে যতটুকু উল্লেখ করা হয়েছে তা সত্যান্বেষী পাঠকের জন্য যথেষ্ট হবার কথা। যে শাসক আল্লাহর দ্বীন দ্বারা শাসন করে না, সে কাফির -এটি দ্বীনের মধ্যে সুসাব্যস্ত, সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুপ্রসিদ্ধ একটি সত্য, এবং এ নিয়ে উম্মাহর মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। আর এ ব্যাপারে সমস্ত দালীল-প্রমানের পরও যে ব্যক্তি প্রশ্ন তোলে তার জন্য শাইখ আশ-শানক্বিতির এ বক্তব্যই প্রযোজ্যঃ

“এ ব্যাপারে শুধু সে ব্যক্তিই সন্দিহান হবে আল্লাহ্ যার দৃষ্টিশক্তি ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং ওয়াহীর উজ্জল আলোর প্রতি তাকে অন্ধ করে দিয়েছেন।”

বিভ্রান্তির জবাব

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি আধুনিক সময়ে শারীয়াহ দিয়ে শাসনের আবশ্যকতাকে মুসলিমদের ভেতর থেকে দুটি শ্রেণী প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করছে, এবং শারীয়াহ ব্যাতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসন, ও শারীয়াহ ব্যাতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসন করে এমন শাসককে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করছে। এ অংশে এ দুটি শ্রেণী থেকে উপস্থাপিত বক্তব্যের অপনোদন করা হবে।

শারীয়াহ সংস্কার/শারীয়াহ পুনঃব্যাখ্য/শারীয়াহ নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন [Shariah Reform, Re-interpretation of Shariah, Epistemological Change in persprective towards Sharia – “Moderate Modern Islam”] সংক্রান্ত বিভ্রান্তির জবাবঃ

বর্তমান সময়ে শারীয়াহ নিয়ে সবচেয়ে দুঃখজনক এবং ভয়ঙ্কর যে বিচ্যুতি আমরা দেখতে পাচ্ছি তা হল একদল লোক প্রচার

করা শুরু করছে আজকের যুগে শারীয়াহ প্রযোজ্য না। এদের কারো কারো মতে শারীয়াহর কিছু অংশ আজ প্রযোজ্য আর কিছু অংশ যেমন – ইসলামী রাষ্ট্র, হুদুদ, জিহাদ, আল ওয়ালা ওয়াল বারা'আ, হিজাব ও নিক্বাব, দাড়ি, চার বিয়ের বৈধতা, সমাজে নারীদের চলাচল ও আচরন এবং নারী ও পুরুষের পারুস্পরিক ইন্টার্যাকশানের ইসলামী কোড অফ কন্ড্যাক্ট এবং এরকম আরও অনেক কিছু আজ আর প্রযোজ্য না। আবার কারো কারো মতে সম্পূর্ণ শারীয়াহই এখন আর প্রযোজ্য না। বরং আধুনিক মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি আর চেতনার পাল্লায় আমরা শারীয়াহকে পরিমাপ করবো, আর শারীয়াহর যা কিছু এগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে আমরা তা গ্রহণ করবো, বাকিগুলো বাদ দেব। তাদের ব্যাখ্যা হল এ বিষয়গুলো ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময়ের জন্য নির্দিষ্ট, এগুলো এখন আর দ্বীনের অংশ না, অথবা দ্বীনের অংশ হলেও এখন আর প্রযোজ্য না। মূলত কিছু পশ্চিমা ইসলামী অর্গানাইজেশন এবং কিছু আলিম, শারীয়াহ রিফর্ম, শারীয়াহর রি-ইন্টারপ্রিটেশান, আজকের যুগে শারীয়াহ প্রযোজ্য না, কিংবা শারীয়াহ নিয়ে মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গির জ্ঞানতাত্ত্বিক ও কাঠামোগত আমূল পরিবর্তনের [epistemological change] প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করছেন। এদের মধ্যে আছেন তারিক রামাদান, হামযা ইউসুফ ও যাইতুনা ইন্সটিটিউট, ইয়াসির কাদ্বি এবং আল-মাগরিব ইন্সটিটিউট ও মুসলিম ম্যাটারস ডট অর্গ, তাউফিক চৌধুরী, নুমান আলী খান এবং আল বাইয়্যিনাহ ইন্সটিটিউট, আইসিএনএ (ইকনা), আইএসএনএ (ইসনা) এবং অন্যান্য আরও অনেকে। দুঃখজনকভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশেও এরকম কিছু দা'ঈ এবং দাওয়াহ ইন্সটিটিউট গড়ে উঠেছে যারা এমন কিছু বিষয় প্রচার করছে যা ক্বুর'আন, সুন্নাহ, সালাফ আস সালেহীনের ইজমা, ১৪০০ বছর ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্মের মুফাসসিরিন, মুহাদ্দিসিন, ফুক্বাহা এবং উলামার ইজমা এবং দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাঙ্ঘর্ষিক। আমরা তাদের এসব নব-উদ্ভাবিত বক্তব্যের দিকে তাকাই, যা তারা হাক্ব বলে প্রচার করছে, এবং আমরা আল্লাহর কিতাব, তাঁর রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ এবং সালাফদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং –এর সাথে এর কোন কিছুর কোন মিল পাইনা। তারপর আমরা তাকাই অ্যামেরিকান তথা ওয়েস্টার্ন পলিসির দিকে, CFR [Council On Foreign Relations], Trilateral Commission, RAND Corporation এর মতো প্রতিষ্ঠানের ইসলামের ব্যাপারে পলিসি সাজেশানের দিকে আর অবাক বিস্ময়ে দেখি প্রথমটা পরেরটার সাথে খাপে খাপে মিলে যায়।

যারা এরকম অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং প্রচার করছেন, যারা বলছেন শারীয়াহ দিয়ে শাসন আজকের সময়ে আবশ্যক না, কিংবা যারা বলছেন শারীয়াহ দিয়ে শাসন করা হবে যখন অধিকাংশ মানুষ তা চাইবে- কিংবা বলছেন ইসলামের কোন একটি বিধান, কোন একটি আহকাম, কোন একটি ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময় প্রযোজ্য ছিল কিন্তু এখন তা আর প্রযোজ্য না। তাদের জবাব দেবার জন্য ইবন হাযমের এই বক্তব্যই যথেষ্ট –

আল্লাহ্‌ র বিধান ত্যাগ করা সম্পর্কে ইবন হাযমের বক্তব্যঃ

আল 'আল্লামা আবু মুহাম্মাদ আলি ইবন আহমাদ ইবন সা'ইদ ইবন হাযম আয যাহিরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন –

“আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আমাদের বলেছেন,

‘...আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।’ [আল-মায়’ইদা, ৩]

এবং তিনি আরো বলেছেন,

‘যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন (জীবনবিধান) তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত।’ [আলে-ইমরান, ৮৫]

অতএব যে বলবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কোন একটি বিধান আজ আর প্রযোজ্য না, এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের পর বিধান বদলে গেছে, সে লোক তো ইতিমধ্যেই ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুকে নিজের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে। কারণ যেসব ইবাদাত, যেসব বিধান, হালালকৃত এবং হারামকৃত কাজ ও বস্তু এবং দ্বীনের আবশ্যক বিষয় হিসেবে যা যা - রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময় নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে, সেটাই হল ঐ ইসলাম যা দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ আমাদের প্রতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের জন্য পছন্দ করেছেন। এটাই ইসলাম, এটা ছাড়া অন্য কোন ইসলাম নেই।

সুতরাং যে ইসলাম থেকে কোন কিছু ছেড়ে দেবে সে তো ইতিমধ্যেই ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। আর যে এর বাইরে (রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময়ের ইসলামের বদলে) অন্য কিছু বলবে, সে ইতিমধ্যেই ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর কথা বলছে। এতে কোন সন্দেহ নেই, এর (ইসলামের) কোন অংশের ব্যাপারেই সন্দেহ নেই, কারণ আল্লাহ্ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন তিনি সুবহানাহু ওয়া তা’আলা ইতিমধ্যেই এই দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গতা দান করেছেন।

আর যে দাবি করে কুর’আনের কোন অংশ কিংবা কোন বিশ্বাসযোগ্য সাহিহ হাদিস রহিত হয়ে গেছে (অর্থাৎ কোন আয়াত বা কোন বিষয় নিয়ে আয়াতসমূহ বা কোন হাদীস বা কোন বিষয় নিয়ে হাদীস এখন আর প্রযোজ্য না) – এবং সে তার দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ আনতে পারে না, কিংবা এমন কোন দালীল আনতে পারে না, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় তার দাবি অনুযায়ী কোন আয়াত রহিত হয় গেছে - এমন ব্যক্তি হল আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার উপর মিথ্যারোপকারী, এবং শারীয়াহ বর্জনের

দিকে আহবানকারী। সে ইতিমধ্যেই ইবলিসের দাওয়াহর দিকে আহবানকারীতে পরিণত হয়েছে এবং সে আল্লাহ্ র রাস্তায় চলার পথে মানুষকে বাধা দিচ্ছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন -

'নিশ্চয় আমরাই এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষক।' [আল-হিজর, ৯]

সুতরাং যে দাবি করে, ক্কুর'আন রহিত হয়ে গেছে [শারীয়াহ আজ আর প্রযোজ্য না, ক্কুর'আনের কোন অংশ, কোন আয়াত বা কোন হুকুম আজ আর প্রযোজ্য না], সে তো তার রাব্বের ব্যাপারে মিথ্যাচার করেছে। সে দাবি করছে আল্লাহ্ স্বয়ং এই কিতাব নাযিল করার পর তা সংরক্ষণ করেন নি।"

[আহকাম ফি উসুলিল আহকাম, খন্ড ১, পৃ ২৭০-২৭১]

অপরিবর্তনীয় কে পরিবর্তন করা যায় না। শারীয়াহ যেভাবে আছে, শারীয়াহর ব্যাপারে যে ব্যাখ্যা এবং দৃষ্টিভঙ্গি সালাফদের থেকে আমরা পেয়েছি সেটিই একমাত্র সঠিক ব্যাখ্যা ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। যুগ,সমাজ কিংবা শাসকের ইচ্ছা-পলিসির সাথে তাল মিলিয়ে আমরা শারীয়াহকে বদলাতে পারি না। একইভাবে আমাদের খেয়ালখুশি মতো, আমাদের সুবিধামতো শারীয়াহর সংস্কার, পুনঃব্যাখ্যা কিংবা শারীয়াহর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে পারি না। শারীয়াহ নাযিল করা হয়েছে যাতে মানবজাতি এই শারীয়াহ অনুযায়ী নিজেদের বদলে নেয়। আমরা তার বদলে আমাদের পছন্দমত, আমাদের ইচ্ছেমত শারীয়াহকে বদলে নিতে, চেরিপিকিং করতে, মডিফাই করতে পারি না। যা আল্লাহ্ 'আযযা ওয়া জাল নির্ধারিত করে দিয়েছেন তাতে হাত দেয়ার অধিকার আমাদের নেই। মুসলিমদের কাজ হল দুনিয়া শারীয়াহ-কমপ্লায়েন্ট বা শারীয়াহ সম্মত বানিয়ে নেয়া। শারীয়াহকে দুনিয়া-কমপ্লায়েন্ট করে চাওয়াটা তাই মারাত্মক পর্যায়ের বিচ্যুতি। আমরা এমন বিচ্যুতিতে আপতিত হওয়া থেকে, পথহারাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে এবং যারা আল্লাহর ক্রোধের উদ্রেক করেছে তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

"শাসকের আনুগত্য" সংক্রান্ত বিভ্রান্তির জবাব

প্রচলিত দ্বিতীয় বিচ্যুতি হল শাসকের আনুগত্য সংক্রান্ত। ইতিপূর্বে শারীয়াহকে পরিবর্তন, সংস্কার, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সংক্রান্ত যে বিভ্রান্তিটি আলোচিত হয়েছে তার সৃষ্টি হয়েছে ইসলামকে পশ্চিমা বিশ্বের মাপকাঠি অনুযায়ী একটি গ্রহণযোগ্য রূপ দেওয়ার জন্য। একারণে যা কিছু পশ্চিমা সেনসিবিলিটি, পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির সাথে যায়, শেষ সেসব কিছু বাদ দেওয়া বা পুনঃব্যাখ্যা বা সংস্কারের একটি প্রবণতা মর্ডানিস্টদের মধ্যে দেখা যায়। আর শাসকের আনুগত্য সংক্রান্ত যে বিচ্যুতিটি, তা গড়ে উঠেছে মুসলিম ভূমিসমূহের শাসকদের অবৈধ শাসনকে বৈধতা দেয়ার জন্য। এ বিচ্যুতিটি আমাদের দেশে অধিক প্রচলিত, বিশেষ করে

যারা নিজেদের "আহলে হাদিস" দাবি করেন তাদের মধ্যে। দুঃখজনক বিষয় হল যদি আসলেই হাদিসের অনুসরণ করার মানসিকতা সব "আহলুল হাদিস" দাবিদারের মধ্যে থাকতো তবে এ বিষয় নিয়ে কোন কথা বলারই প্রয়োজন হতো না। কারণ এ ব্যাপারে শারীয়াহর বক্তব্য সুস্পষ্ট।

শাসকের আনুগত্য সংক্রান্ত এ বিভ্রান্তির প্রচারকদের বক্তব্য নিম্নরূপ-

"শাসকের আনুগত্য করতে হবে। শাসকের আনুগত্য করার আবশ্যকতা সাহিহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যতক্ষণ শাসক সালাত কায়েম রাখবে ততোক্ষণ তার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া যাবে না। ততক্ষণ আনুগত্য করতে হবে। শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। এটাই শারীয়াহর বিধান।"

তাদের এই বক্তব্যের স্বপক্ষে দুটি যুক্তি উপস্থাপিত হয় -

১) শাসকের আনুগত্যের হাদিস

২) ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কুফর দুনা কুফর উক্তি

আমরা এ দুটো বিষয় নিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করবো এবং প্রমাণ করবো কোন কোন শার'ঈ কারণে এ অবস্থান বাতিল। আমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে আমরা যে দালীল প্রমাণ গুলো পেশ করবো তা হলঃ

- কোন শাসকের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে হাদীস থেকে তার প্রমাণ

- কুফর দুনা কুফর সংক্রান্ত আলোচনা ও সঠিক ব্যাখ্যা

- তাগুতকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করার আবশ্যকতা

- যে শাসক শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে না তার কাফির হবার ব্যাপারে ইজমা। [যা ইতিমধ্যে দালীল এবং অতীত ও আধুনিক কালের 'উলামাগনের বক্তব্যসহ উল্লেখ করা হয়েছে]

১। কোন শাসকের আনুগত্য করতে হবে?

একথা সত্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের শাসকের আনুগত্য করতে বলেছেন। এ ব্যাপারে বেশ কিছু হাদীস আছে। যেমন-

১। মুহাম্মাদ ইবনু সাহল ইবনু আসকার তামীমী ও আবদুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান দারেমী (রহঃ) হুযায়ফা ইবনু ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ "আমি আরয করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমরা ছিলাম অমঙ্গলের মধ্যে; তারপর আল্লাহ আমাদের জন্য মঙ্গল নিয়ে আসলেন। আমরা তাতে অবস্থান করছি। এ মঙ্গলের পিছনে কি আবার কোন অমঙ্গল আছে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আমি বললাম এ মঙ্গলের পিছনে কি আবার কোন অমঙ্গল আছে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আমি বললাম, এ মঙ্গলের পিছনে কি আবার কোন অমঙ্গল আছে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আমি বললাম, তা কিভাবে? তিনি বললেনঃ আমার পরে এমন সব নেতার উদ্ভব হবে, যারা আমার হেদায়েতে হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে না এবং সুন্নাতও তারা অবলম্বন করবে না। তাদের মধ্যে এমন সব লোকের উদ্ভব হবে, যাদের অন্তঃকরণ হবে মানব দেহে শয়তানের অন্তঃকরণ। রাবী বলেনঃ তখন আমি বললাম, তখন আমরা কি করবো ইয়া রাসুলুল্লাহ! যদি আমরা সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হই? বললেনঃ তুমি শুনবে এবং মানবে যদি তোমার পিঠে বেত্রাঘাত করা হয় বা তোমার ধন-সম্পদ কেড়েও নেয়া হয়, তবুও তুমি শুনবে এবং মানবে।" [সাহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ (ইসলামিক ফাউন্ডেশানের অনুবাদে, "রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রশাসন" অধ্যায়) ৪৬৩২]

২। হাসান ইবনু রাবী (রহঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ "রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার আমীরের মধ্যে এমন কোন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে, যা সে অপছন্দ করে তবে সে যেন ধৈর্যধারণ করে, কেননা যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ সরে গেল এবং এ অবস্হায় মৃত্যুবরণ করল সে জাহেলিয়তের মৃত্যুই বরণ করলো।" [সাহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, ৪৬৩৭]

৩। হাদ্দাব ইবনু খালিদ আযদী (রহঃ) উম্মে সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ অচিরেই এমন কতক আমীরের উদ্ভব ঘটবে তোমরা তাদের চিনতে পারবে এবং অপছন্দ করবে। যে জন তাদের স্বরুপ চিনল সে মুক্তি পেল এবং যে

জন তাদের অপছন্দ করল-নিরাপদ হল। কিন্তু যে জন তাদের পছন্দ করল এবং অনুরসরণ করল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হল)। লোকেরা জানতে চাইল আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না? রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ না, যতক্ষন তারা সালাত আদায়কারী থাকবে।” [সাহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, ৪৬৪৭]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আসলেই হাদিস আছে যেখানে বলা হয়েছে শাসকের আনুগত্য করতে, নিজের পছন্দে ও অপছন্দে, ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়, যদি শাসক যালিম হয়, যদি শাসক অত্যাচার করে তবুও, যদি জনগণ ও শাসক পরস্পরকে ঘৃণা করে, তবুও। তবে একটা প্রশ্ন থেকে যায়। এই আনুগত্য কি সব শাসকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? শাসক যদি কাফির, মুশরিক, মুরতাদ হয়? শাসক যা-ই দিয়েই শাসন করুক না কেন, বাইবেল-গীতা-অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন কিংবা অন্য কোন মানুষের তৈরি সংবিধান – তার আনুগত্য করতে হবে? সে যদি আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন সেটাকে হালাল করে (যেমন সুদ), কিংবা আল্লাহ্ যা হালাল করেছে তা হারাম করে (যেমন জিহাদ, হিজরত) তবুও কি তার আনুগত্য করতে হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আমাদের এই নির্দেশই দিয়ে গেছেন?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাবার জন্য আরও কিছু হাদিসের দিকে তাকানো যাক -

১। মুহাম্মদ ইবনু মূসান্না (রহঃ), ইয়াহইয়া ইবনু হুসায়ন (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ “আমি আমার দাদী থেকে শুনেছি, তিনি নাবী ﷺ -এর বিদায় হজ্জের ভাষণদান কালে তাঁকে বলতে শুনেছেনঃ যদি তোমাদের উপর একজন গোলামকেও কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয় আর সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুসারে পরিচালনা করে, তবে তোমরা তার কথা শুনবে এবং মানবে।” [সাহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ৪৬০৬]

২। সালামা ইবনু শাবীব (রহঃ), ইয়াহইয়া ইবনু হুসায়ন এর দাদী উম্মুল হুসায়ন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাবী ইয়াহইয়া ইবনু হুসাইন বলেনঃ “আমি তাকে বলতে শুনেছি আমি বিদায় হজ্জে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে হজ্জ আদায় করি। তিনি (রাবী) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন অনেক কথাই বলেছিলেন। এরপর আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, যদি তোমাদের উপর কোন হাত পা কাটা গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয় (ইয়াহইয়া ইবনু হুসাইন বলেনঃ) আমার ধারণা হয় তিনি (দাদী আরও) বলেছেনঃ কালো (অর্থাৎ কৃষ্ণকায় হাবশী গোলাম) আর সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুসারে পরিচালিত করে তবে তোমরা তার কথা শুনবে এবং মানবে।” [সাহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ৪৬১০]

৩। কুতায়বা ইবনু সাঈদ (রহঃ) ইবনু উমার (রাঃ) এর সুত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ “মুসলিম ব্যক্তির

অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হচ্ছে শোনা ও মানা তার প্রতিটি প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যাপারে- যে যাবৎ না তাকে আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ করা হয়। যদি আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ তাকে দেয়া হয় তা হলে তা শুনতে হবে না, মানতে হবে না।” [মুত্তাফাক্কুন আলাইহ, সাহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ৪৬১১, সাহিহ বুখারি কিতাবুল আহকাম]

৪। মুহাম্মাদ ইবনু মূসান্না ও ইবনু বাশশার (রহঃ) আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ “রাসুলুল্লাহ ﷺ একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং এক ব্যক্তিকে তার আমীর নিযুক্ত করে দেন। সে একটা আগুন প্রজ্জলিত করলো এবং তাদেরকে তাতে ঝাঁপ দিতে নির্দেশ দিল। একদল লোক তাতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হলো এবং অপর একদল বললো, আমরা (ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তো) আগুন থেকেই আত্মরক্ষা করেছি। (সুতরাং আগুনে ঝাঁপ দেয়ার প্রশ্নই উঠেনা)। যথা সময়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো। তখন তিনি যারা আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়েছিল তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তখন তোমরা যদি সত্যি সত্যি আগুনে ঝাঁপ দিতে তবে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাতেই অবস্হান করতে। পক্ষান্তরে অপরদলকে লক্ষ্য করে তিনি উত্তম কথা বললেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহর অবাধ্যতায় আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবলই সৎ কাজে।” [সাহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ৪৬১৩]

৫। উবাদা ইবন সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ
عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

অর্থাৎ, “রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ডাকলেন এবং আমরা বাইয়াত হলাম। তিনি তখন আমাদেরকে যে শপথ গ্রহণ করান তার মধ্যে ছিল – ‘আমরা শুনবো ও মানবো, আমাদের অনুরাগে ও বিরাগে, আমাদের সংকটে ও স্বাচ্ছন্দ্যে এবং আমাদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিলেও যোগ্য ব্যক্তির সাথে আমরা নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দল করবো না।’ তিনি বলেন, ‘যে যাবৎ না তোমরা তার মধ্যে প্রকাশ্য কুফর দেখতে পাবে এবং তোমাদের কাছে এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে আল্লাহর সুস্পষ্ট দলীল থাকবে।’” [মুত্তাফাকুন আলাইহি; সহীহ মুসলিম ইস. ফাউ. হাদীস নং ৪৬১৯]

৬। আল্লাহর নাফরমানীর কাজে কোনরূপ আনুগত্য নেই। আনুগত্য করতে হয় কেবলমাত্র ন্যায়সঙ্গত কাজে। [মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারি ৭২৫৭, মুসলিম ১৮৪০]

৭। “আল্লাহ্ র অবাধ্যতায় কোন মানুষের আনুগত্য নেই।” [মুসনাদে আহমাদ, ১০৯৮]

৮। ‘আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, “রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ক্ষুদ্র সেনাদল পাঠালেন এবং এক ব্যক্তিকে তাঁদের ‘আমীর নিযুক্ত করে দিলেন। তিনি (‘আমীর) আগুন জ্বালালেন এবং বললেন, তোমরা এতে প্রবেশ কর। কতক লোক তাতে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল। তখন অন্যরা বলল, আমরা তো (মুসলিম হয়ে) আগুন থেকে পালাতে চেয়েছি। অতঃপর তারা এ ঘটনা নাবী সাল্লাল্লাহু ﷺ এর নিকট জানাল। তখন যারা আগুনে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন তাদেরকে বললেনঃ যদি তারা তাতে প্রবেশ করত তাহলে ক্বিয়ামাত পর্যন্তই সেখানে থাকত। আর অন্যদেরকে বললেনঃ আল্লাহর নাফরমানীর কাজে কোনরূপ আনুগত্য নেই। আনুগত্য করতে হয় কেবলমাত্র ন্যায়সঙ্গত কাজে।” [সহীহ বুখারী (তাওহীদ) অধ্যায়ঃ ৯৫/ 'খবরে ওয়াহিদ' গ্রহণযোগ্য হাদিস নম্বরঃ ৭২৫৮ (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৭৫০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৭৬৩]

৯। ইমরান বিন হুসাইন বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন – “আল্লাহ্ র অবাধ্যতা করে এমন কারো প্রতি আনুগত্য নেই।” [মুসনাদের আহমাদ (৫/৬৬) এবং শাইখ আল-আলবানী আল-সাহিহাহ তে একে সাহিহ বলেছেন আল-মুসলিমের শর্তানুযায়ী]

১০। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন – “স্রষ্টার অবাধ্যতা করে সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই।” [সাহিহ বুখারি হাদীস নং ৪৩৪০, সাহিহ মুসলিম হাদীস নং ১৮৪০, সুনান আল-নাসাই, হাদীস নং, ৪২০৫, সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং, ২৬২৫, মুসনাদ আহমাদ খন্ড ১, পৃঃ ১৩১]

সুতারাং দেখা যাচ্ছে যে সত্যবাদী রাসূল ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন শাসকের আনুগত্য করার তিনিই ﷺ আনুগত্যের ব্যাপারে বেশ কিছু শর্তও আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, যেমন –

১। আল্লাহ্ র কিতাব দ্বারা শাসন করা শাসকের আনুগত্য করতে হবে সে অত্যাচারী হলেও, হাবশী, বিকৃত শরীরের গোলাম হলেও, তাকে আমাদের অপছন্দ হলেও, সে আমাদের প্রহার করলেও

২। আনুগত্য হবে আল্লাহ্ র বাধ্যতায়

৩। আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই

৪। আনুগত্য করতে হবে যতক্ষণ না শাসকের মধ্যে কোন প্রকাশ্য কুফরী দেখা যাবে এবং সে কাজ কুফরী হবার ব্যাপারে শারীয়াহ থেকে সুস্পষ্ট দালীল থাকবে।

এছাড়া স্বয়ং আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল আমাদের আনুগত্যের ভিত্তি সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন-

"বস্তুতঃ আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়।" [আন-নিসা, ৬৪]

এই আয়াতটি এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে কারণ ঠিক পরের আয়াতেই আল্লাহ্‌ কসম করে বলছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বিচারক এবং তার আনীত শারীয়াহ দ্বারা শাসন মেনে নেয়ার আগ পর্যন্ত কারো ইমান আসবে না। এখান থেকে সুস্পষ্ট আল্লাহ্‌ 'আযযা ওয়া জাল রাসূলের ﷺ প্রতি আনুগত্য ফরয করছেন এবং তা সংযুক্ত করেছেন - "আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা" –র সাথে। যদি খোদ রাসূলের ﷺ ক্ষেত্রে আনুগত্য করা হবে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী বলে আল্লাহ্‌ আমাদের জানিয়ে দিয়ে থাকেন, তাহলে কিভাবে শাসকের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিরোধিতায় আনুগত্য থাকতে পারে?

এ কারণে শাসকের আনুগত্য সম্পর্কিত সকল হাদীস থেকে দুটো জিনিষ স্পষ্টভাবে বোঝা যায় -

১। "শাসকের আনুগত্য করতে হবে" – এ আদেশ ঐ শাসকের ব্যাপারে প্রযোজ্য যে শাসন করে কিতাবুল্লাহ তথা শারীয়াহ দ্বারা

২। "শাসকের আনুগত্য করতে হবে" – এ আদেশ কোন কাফির-মুশরিক-মুরতাদ শাসকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না

এক্ষেত্রে ইমাম নাওয়াউয়ীর বক্তব্য তুলে ধরা হলঃ

ইমাম আন-নাওয়াউয়ী বলেছেন, "আল-ক্বাদ্বি 'ইয়াদ্ব বলেছেন, 'উলামাদের ইজমা হল নেতৃত্ব (ইমামাহ) কখনো কাফিরের উপর অর্পণ করা যাবে না, আর যদি (কোন নেতার) তার পক্ষ থেকে কুফর প্রকাশিত হয় তবে তাকে হটাতে হবে... সুতরাং যদি সে কুফর করে, এবং শারীয়াহ পরিবর্তন করে অথবা তার পক্ষ থেকে গুরুতর কোন বিদ'আ প্রকাশিত হয়, তবে সে নেতৃত্বের মর্যাদা হারিয়ে ফেলবে, এবং তার আনুগত্য পাবার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে, এবং মুসলিমদের জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে তার বিরোধিতা করা, বিদ্রোহ করা, তার পতন ঘটানো এবং তার স্থলে একজন ন্যায়পরায়ণ ইমামকে বসানো – যদি তারা (মুসলিমরা) সক্ষম হয়। যদি একটি দল (তাইফা) ব্যাতীত অন্যান্য মুসলিমদের পক্ষে এটা করা সম্ভব না হয়, তবে যে দলের (তাইফা) সক্ষমতা আছে তাদের জন্য এই কাফিরের (শাসকের) বিরোধিতা করা, বিদ্রোহ করা এবং তার পতন ঘটানো অবশ্য কর্তব্য। আর যদি শাসক কাফির না হয়ে শুধুমাত্র বিদ'আতী হয় তবে, এটা বাধ্যতামূলক হবে না, যদি তারা (তাইফা) সক্ষম হয় তবে তারা তা করবে। আর যদি কেউই সক্ষম না হয় এ ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়, তবে বিদ্রোহ করা আবশ্যক না, তবে তখন মুসলিমদের সেই ভূমি থেকে অন্য কোথাও হিজরত করতে হবে, নিজেদের দ্বীনের সংরক্ষণের জন্য।"[সাহিহ মুসলিম বি শারহ আন-নাওয়াউয়ী, ১২/২২৯]

সুতরাং আমরা দেখতে পাই শাসকের আনুগত্যের হাদীসগুলোতে ঐ সব শাসকদের কথা বলা হচ্ছে যারা শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে এবং যারা মুসলিম শাসক। মুসলিম শাসক যদি শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে, তবে সে যদি ফাসেক হয়, যালিম হয় তথাপি আল্লাহ্‌ র বাধ্যতার ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করতে হবে। কিন্তু যে শাসক প্রকাশ্য কুফরী করে, আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ দেয় এবং যে কাফির আসলি অথবা কাফিরে পরিণত হয়েছে তার আনুগত্য যে করতে হবে না এটা হাদীস থেকেই প্রমানিত।

যারা কোন রকম বাছবিচার ছাড়াই শাসকের আনুগত্য করার কথা বলেন তারা দালীল হিসেবে আর একটি বিষয় উপস্থাপন করার চেষ্টা করতে পারেন আর তা হল ক্বুর'আনের সূরা নিসার ৫৯ নম্বর আয়াত-

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের।"...

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ আয়াত তাদের বিপক্ষে দালীল। ইবন কাসীরর এই আয়াতের তাফসিরে উপরের হাদীসগুলো এনেছেন এবং তারপর স্পষ্টভাবে বলেছেন আনুগত্যের বিষয়টি শুধুমাত্র আল্লাহর বাধ্যতা এবং ওয়াহী অনুযায়ী শাসন-মীমাংসা এবং ফায়সালার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এছাড়া আল্লাহ্ এ আয়াতে বলেছে "...ওয়া উলিল আমরি মিনকুম" অর্থাৎ এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা বিচারক ও নেতৃস্থানীয়। আর এতো সুস্পষ্ট সত্য যে কাফির, মুশরিক ও মুরতাদীন কখনোই মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত না।

সুতরাং হাদীস এবং ক্বুর'আন থেকে প্রমাণিত হয় আনুগত্য ঐ মুসলিম শাসকের ক্ষেত্রে আবশ্যক যে শাসন করে শারীয়াহ দিয়ে। যে শাসক শারীয়াহর বদলে মানবরচিত কোন সংবিধান দিয়ে শাসন করে তার আনুগত্য করতে মুসলিমদের আদেশ করা হয় নি। বরং আল কাদ্বি ইয়াদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট মুসলিমদের কর্তব্য হল এমন শাসকের বিরোধিতা ও বিদ্রোহ করা।

কুফর দুনা কুফর

শাসকের আনুগত্যের পক্ষে আরেকটি অত্যন্ত দুর্বল কিন্তু কিছু কিছু বলয়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি অজুহাত আছে, আর তা হল "কুফর দুনা কুফর"- নামে পরিচিত উক্তিটির অপব্যাখ্যা। এ অংশে আমরা দেখবোঃ

১।কুফর দুনা কুফর – উক্তিটির সনদ বা বর্ণনাসূত্র কতোটা সাহীহ?

২। কুফর দুনা কুফরের সঠিক ব্যাখ্যা কি

৩। কুফর দুনা কুফর দিয়ে কি আদৌ আজকের শাসকদের বৈধতা দেয়া যায় কি না, এবং এ ব্যাপারে 'উলামাদের বক্তব্য

এ অংশটি পড়ার আগে শারীয়াহর কিছু পারিভাষিক শব্দ সম্পর্কে জেনে নেওয়া প্রয়োজনঃ

কুফর আসগর – ছোট কুফর, যার কারণে মানুষ কাফিরে পরিণত হয় না

কুফর আকবার – বড় কুফর, যা মানুষকে কাফিরে পরিণত করে

কুফর দুনা কুফর – একটি উক্তি যা ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। কুফর দুনা কুফর অর্থ এমন কাজ যা কুফর, কিন্তু তা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় না। অর্থাৎ কুফর কিন্তু কুফর আসগর।

কুফর দুনা কুফর সংক্রান্ত বর্ণনাঃ

আল হাকিম বলেছেনঃ আহমাদ ইবন সুলায়মান আল-মাউসুলি আমাদের জানিয়েছেনঃ 'আলি ইবন হারব আমাদের বলেছেনঃ সুফিয়ান ইবন উয়াইনা আমাদের বলেছেনঃ হিশাম ইবন হুজাইর থেকে তিনি বলেছেনঃ তাউস থেকে, তিনি বলেছেনঃ ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেনঃ

"এটা ঐ কুফর যে কুফর না যা তারা নির্দেশ করছে। এটা ঐ কুফর না যা ব্যক্তিকে মিল্লাহ (দ্বীন ইসলাম) থেকে বের করে দেয়।'...যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।' এটা কুফর দুনা কুফর [অর্থাৎ, কুফর যা কুফর আকবর অপেক্ষা কম বা নিম্ন পর্যায়ের]" [আল-মুসতাদরাক 'আলাস –সাহিহাইন, খন্ড ২/৩১৩]

কুফর দুনা কুফর দ্বারা শাসকের আনুগত্যপন্থীরা ঠিক কি বোঝায়?

যারা "কুফর দুনা কুফর" উক্তিটিকে শাসকের আনুগত্যের স্বপক্ষে অজুহাত হিসেবে দাড় করাতে চান, তাদের বক্তব্য হল – "আল্লাহর আইনদ্বারা শাসন করা ব্যক্তির কুফর হল, কুফর আসগর। একারণে, যে শাসক আল্লাহর আইন দ্বারা শাসন করে না সে কাফির না। এবং একারণে শাসকের আনুগত্যের হাদীস অনুসারে এসব শাসকদের আনুগত্য করা আবশ্যক। আর এটাই সায়্যিদিনা ইবন 'আব্বাসের অবস্থান।"

ইতিমধ্যে আমরা যা উপস্থাপন করেছি তার আলোকেই এ অবস্থান বাতিল বলে প্রমাণিত হয়। কারণ-

প্রথমত, ক্বুর’আনের স্পষ্ট আয়াতসমূহের ফাক্বিহ এবং ‘উলামাগণের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হল শারীয়াহ দ্বারা শাসন না করা ব্যক্তি কাফির।

দ্বিতীয়ত, এই উক্তিটি ব্যবহার করা হয় সূরা মায়’ইদার ৪৪ নম্বর আয়াতের ব্যাপারে। কিন্তু যদি আল-মায়’ইদা ৪৪ নম্বর আয়াতকে আমরা দালীল হিসেবে উপস্থাপন নাও করি, তথাপি অন্য আরও আয়াত আছে যেগুলো সুস্পষ্ট এবং যেগুলো শারীয়াহ দ্বারা শাসন না করা ব্যক্তি কাফির এবং শারীয়াহ ব্যাতীত অন্য কোন শাসন কামনাকারী কাফির হিসেবে প্রমাণিত হয়, এবং এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে এসেছে।

তৃতীয়ত, শাসকের আনুগত্য সংক্রান্ত হাদিস সমূহের আলোচনায় আমরা দেখেছি আনুগত্যের যে আদেশ হাদীস থেকে আমরা পাই তা প্রযোজ্য শারীয়াহ দ্বারা পালনকারী মুসলিম শাসকের ক্ষেত্রে। কুফর দ্বারা শাসনকারী কাফিরের ক্ষেত্রে না। আনুগত্য আল্লাহর বাধ্যতার ক্ষেত্রে, অবাধ্যতার ক্ষেত্রে না। বরং ‘উলামাগনের ইজমা হল কাফিরকে শাসনভার দেয়া যাবে না। শাসক যদি কাফির হয় বা প্রকাশ্য কুফরী তার থেকে প্রকাশ পায় তবে তার বিরোধিতা এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর্তব্য।

যদিও এসব কারণে “কুফর দুনা কুফর”-এর কুফরের আড়ালে বর্তমান শাসকদের বৈধতা দেয়ার তাদের এই দুর্বল প্রচেষ্টাকে সহজেই বাতিল বলে প্রমাণ করা যায়। আলহামদুলিল্লাহ। তথাপি আমরা কুফর দুনা কুফর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো যাতে করে কারো মধ্যে এ বিষয়ে সংশয়ের ছিটেফোটাটুকুও না থাকে, এবং অপব্যাখ্যাকারীদের অপব্যাখ্যা যেন তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে না পারে।

কুফর দুনা কুফর – উক্তিটির বর্ণনা সূত্র বা সনদ কতোটা গ্রহণযোগ্যঃ

প্রথমে লক্ষ্যনীয় বিষয় হল এই বর্ণনাটির সনদ সাহীহ হওয়া সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে, যারা এই বর্ণনাটির সনদ সাহীহ বলে মনে করেন না তাদের বক্তব্য নিচে তুলে ধরা হলঃ

১। আল হাকিম বলেছেন আহমাদ ইবন সুলায়মান আল-মাউসুলি আমাদের জানিয়েছেনঃ ‘আলি ইবন হারব আমাদের বলেছেনঃ সুফিয়ান ইবন উয়াইনা আমাদের বলেছেনঃ হিশাম ইবন হুজাইর থেকে তিনি বলেছেনঃ তাউস থেকে, তিনি বলেছেনঃ

ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেনঃ

“এটা ঐ কুফর যে কুফর না যা তারা নির্দেশ করছে। এটা ঐ কুফর না যা ব্যক্তিকে মিল্লাহ (দ্বীন ইসলাম) থেকে বের করে দেয়।‘...যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।’ এটা কুফর দুনা কুফর [অর্থাৎ, কুফর যা কুফর আকবর অপেক্ষা কম বা নিম্ন পর্যায়ের]”

[আল-মুসতাদরাক ‘আলাস –সাহিহাইন, খন্ড২/৩১৩]

ইবন ’আবি হাতিমও তার তাফসির গ্রন্থে, একই সনদে বর্ণনা করেছেন, হিশাম ইবন হুজাইর বর্ণনা করেছেন তাউস থেকে, আর তাউস বর্ণনা করেছেন ইবন ‘আব্বাস থেকে – ‘...যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।’ (এই আয়াতের ব্যাপারে) ইবন আব্বাস বলেছেন ‘এটা ঐ কুফর না যা তোমরা নির্দেশ করছো।’ বেশ কিছু কারণে এই বর্ণনাটি দুর্বল। প্রথম কারণ হল, এই সনদে হিশাম ইবন হুজাইর আছেন। আহমাদ ইবন হানবাল, ইয়াহইয়া ইবন মা’ইন, সুফিয়ান ইবন ‘উয়াইনা, ইয়াহিয়া ইবন সা’ইদ এবং অন্যান্যরা তাকে (হিশাম ইবন হুজাইরকে) দুর্বল ঘোষণা করেছেন। [দেখুন “তাহ’সিব আত-তাহ’সিব”, খন্ড ৬/২৫, “আল কামিল ফি দু’আফা’ আর-রিজাল”, খন্ড ৭/২৫৬৯, “আদ্ব-দু’আফা’ আল-কাবির”, খন্ড৪/২৩৮, “হাদী আস-সারি”, খন্ড ৪৪৭-৪৪৮, “তাহ’সিব আল-কামাল”, খন্ড ৩০/১৭৯]

দ্বিতীয় কারণ হল, তাউস থেকে শুধুমাত্র হিশাম ইবন হুজাইরই এই শব্দাবলী (অর্থাৎ “কুফর দুনা কুফর”)সহ বর্ণনা করেছেন, আর কোন বর্ণনাকারী এই শব্দাবলী বর্ণনা করেন নি। তাউসের সকল সঙ্গীদের মধ্যে শুধুমাত্র হিশাম ইবন হুজাইর কতৃক তাউস থেকে এই শব্দাবলী বর্নিত হওয়া আরেকটি দুর্বলতা। একে বলা হয় তাফাররুদ।

তৃতীয়ত, হিশামের এই বর্ণনা তার অপেক্ষা অধিক গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক, বিশেষ করে আব্দুল্লাহ ইবন তাউসের বর্ণনার সাথে, কারণ যখন আব্দুলুল্লাহ ইবন তাউস তার পিতার থেকে এটা বর্ণনা করেছেন তিনি “কুফর দুনা কুফর” এর পরিবর্তে বলেছেন “এটা হল কুফর”। [“তাফসির ‘আব্দুর-রাযযাক, খন্ড ১/১৮৬, তা’সিম ক্বাদর আস-সালাত, পৃঃ ৩৯, জামি’ আল০বায়ান, খন্ড ১০/৩৫৬ এবং অন্যত্র]

যদি “কুফর দুনা কুফর”-এর সনদ দুর্বলই হয়ে থাকে তাহলে কেন আল-হাকিম একে সাহিহ বলেছেন এবং আল-আলবানী বলেছেন “দুই শাইখের (বুখারি ও মুসলিম) শর্তানুযায়ী সাহিহ”?

সম্ভবত এরকম বলার পেছনে কারণ হল, হিশাম ইবন হুজাইর থেকে বর্ণনা সাহিহ বুখারী ও সাহিহ মুসলিমে আছে। কিন্তু তার উপরে এই ইমামদ্বয় নির্ভর করেন নি।

এর অর্থ কি? এর অর্থ হল আল-বুখারি ও মুসলিম অনেক ক্ষেত্রেই সাহিহ সনদের হাদিস বর্ণনা করার পর। সেগুলোর (অর্থাৎ সাহিহ সনদের বর্ণনার) আগে অথবা পরে, আনুষঙ্গিক বর্ণনা হিসেবে একই হাদিসের ঐসব বর্ণনা এনেছেন যেটাতে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী আছে। হিশাম ইবন হুজাইর এরকম শুধুমাত্র একটি বর্ণনাসূত্রে সাহীহ বুখারীতে আছেন এবং মাত্র দুটি বর্ণনা সূত্রে সাহিহ মুসলিমে আছেন।

সাহিহ বুখারিতে আছেন নাবী সুলাইমান ইবন দাউদ আলাইহিস সালামের হাদিসের সনদেঃ

"সুলাইমান আলাইহিস সালাম একদা বলেছিলেন যে, অবশ্যই আজ রাতে আমি নব্বইজন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হব" - শপথের কাফফারা অধ্যায়ে। কিন্তু বিয়েশাদী অধ্যায়ে একই হাদিসের বর্ণনায় তার বদলে আব্দুল্লাহ ইবন তাউসকে রাখা হয়েছে।

একইভাবে, সাহিহ মুসলিমের শুধুমাত্র দুটি হাদিসের সনদে হিশাম ইবন হুজাইর আছেন। আর ইমাম মুসলিম শুধু মাত্র তখনই হিশাম ইবন হুজাইরের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন যখন একই হাদিসের অন্য সনদে অন্য বর্ণনাকারী হিশাম ইবন হুজাইরকে প্রতিস্থাপিত করেছে। এর মধ্যে প্রথম বর্ণনাটি হল সুলাইমান আলাইহিস সালামের হাদিসটি যা একেবারে একই শব্দাবলী এবং সনদে বর্ণিত হয়েছে, এবং ঠিক তার পরের বর্ণনাতেই হিশামের জায়গায় আব্দুল্লাহ ইবন তাউস এসেছেন, যেমনটা সাহীহ বুখারিতে হয়েছে।

আর হিশাম ইবন হুজাইর থেকে অন্য যে বর্ণনাটি সাহিহ মুসলিমে আছে তা হল আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিতঃ
"মু'ওয়াইয়া আমাকে বললেনঃ 'তুমি কি জান আমি মারওয়াতে কাঁচি দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মাথা থেকে চুল কেটেছিলাম?' তখন আমি তাকে বললাম, 'এটা আমাদের পক্ষে একটি যুক্তি..."

আর ঠিক তার পরের বর্ণনাতেই সনদে হিশামের জায়গায় আল-হাসান ইবন মুসলিম আছেন।

এ ব্যাপারে আরও জানার জন্য দেখুন আল হারাউয়ীর, “খুলাসাত আল-ক্বাওল আল-মুফহিম ‘আলা তারাজিম রিজাল আল-ইমাম মুসলিম”।

অতএব, যদিও আল-হাকিম, আল-আলবানী এবং আরও কেউ কেউ একে সাহীহ বলেছেন, কিন্তু তারা খুব সম্ভবত তা বলেছেন এ ব্যাপারগুলোর (বুখারি ও মুসলিমে সর্বমোট তিনটি বর্ণনার সনদে হিশামের উপস্থিতির কারণে) উপর ভিত্তি করে। কিন্তু এটা রাবীদের সাহীহ হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হবার নিশ্চিত পদ্ধতি না। এবং এটা ইমাম বুখারি ও মুসলিম শুধুমাত্র হিশাম থেকে ঐসব বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, যা অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত – এ থেকেও এটাই প্রতিভাত হয়।

পরিশেষে, শুধুমাত্র আল-হাকিমের তাহক্বিকের উপর ভরসা করা অনুচিত। এ ব্যাপারটি আলোচিত হয়েছে ইবন তাইমিয়্যাহর “ক্ব’ইদাতুন জালিলাহ ফিত-তাওয়াসসুল ওয়াল-ওয়াসিলাহ” পৃঃ ১৭০-১৭১, ইবনুল কাইয়্যিমের “আল-ফারুসিয়্যাহ”, পৃঃ ২৪৫ ও ২৭৬, আদ্ব-দ্বাহাবির “সিয়ার আ’লাম আন নুবালা”, খন্ড ১৭/১৭৫, ইবন হাজারের “আন-নুকাত ‘আলা কিতাব ইবন আস-সালাহ”, খন্ড ১/৩১৪-৩১৮ এবং অন্যত্র।

২। “কুফর দুনা কুফর” এই বর্ণনাটির আরেকটি দুর্বলতা হল তাউস থেকে শুধুমাত্র হিশাম ইবন হুজাইর এই শব্দাবলী বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ এটি তাফাররুদ (শুধুমাত্র একজন রাবী থেকে বর্ণিত)। তাউসের সকল সঙ্গীদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র একজন (হিশাম) এ শব্দাবলীসহ বর্ননা করেছেন-এটি একটি বড় দুর্বলতা। কারণ তাউসের সঙ্গী অন্যান্য বিখ্যাত বর্ণনাকারীরা, যেমন ‘আমর ইবন দিনার, ‘আব্দুল্লাহ ইবন তাউস (তাউসের ছেলে), ইব্রাহীম ইবন মাইসারাহ, আবু আয –যুবাইর আল-মাক্কি এবং হাসান ইবন মুসলিম ইবন ইয়ান্নাক্ব এটি বর্ণনা করেন নি। পাশাপাশি তাউসের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন (সাহীহ অথবা দুর্বল সূত্রে) এমন কোন বর্ণনাকারী (এবং তাদের সংখ্যা কয়েক ডজন) এই শব্দাবলী- কুফর দুনা কুফর – বর্ণনা করেন নি। এবং তাদের মধ্যে আছেনঃ

আল-হাকাম ইবন ‘উতায়বাহ, আব্দুল-কারিম আল জাযারি, ইব্রাহিম আল-আখনাসি, সুলাইমান আত-তাইমি, হানযালা ইবন আবি সুফিয়ান, উসামা ইবন যাইদ আল-লাইসি, হাবিব ইবন আবি সাবিত, উবায়দাল্লাহ ইবন আল-ওয়ালিদ আল-ওয়াসিফি, সা’দ ইবন সিনান আশ-শায়বানি, সুলায়মান আল-আহওয়াল, ‘আমর ইবন ক্বাতাদাহ, ইব্রাহীম ইবন ইয়াযিদ আল-খুযি, সুলাইমান ইবন মুসা আদ-দিমাশকি, সাই’দ ইবন হাসসান, আবু শু’আইব আত-তায়ালিসি, সাদাক্বাহ ইবন ইয়াসার, আদ্ব-দ্বাহহাক ইবন মুযাহিম, ‘আমির ইবন মুস’আব, আব্দুল্লাহ ইবন আবি নাজিহ, আব্দুল-কারিম আবু উমাইয়্যাহ আল-বাসরি, আব্দুল মালিক ইবন জুরাইয়ি, আব্দুল মালিক ইবন মাইসারাহ, ‘আতা ইবন আস-সাই’ব, ইকরিমা ইবন ‘আম্মার, আবু আব্দুল্লাহ আশ-শামি, ‘আমর

ইবন শু’আইব, ‘আমর ইবন মুসলিম আল-জানাদি, ক্বাইস ইবন সা’দ, লাইস ইবন আবি সুলাইম, মুজাহিদ ইবন জাবর, ইবন শিহাব আয-যুহরি, আল-মুগীরাহ ইবন হাকিম আস-সান’আনি, মাক’হুল আল-হুসালি, আন-নু’মান ইবন আবি শায়বাহ, হানি’ ইবন আইয়্যুব, ওয়াহহাব ইবন মুনাব্বিহ।

উপরোক্ত কোন রাবী “কুফর দুনা কুফর” শব্দাবলী বর্ণনা করেন নি। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় আব্দুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে এই বর্ণনা ও শব্দাবলী প্রমাণিত নয়।

[“কুফর দুনা কুফরের” সনদ দুর্বল হওয়া সম্পর্কে আল্লামা শাইখ সুলাইমান বিন নাসির আল-‘উলওয়ানের উপরোক্ত বক্তব্য গ্রহণ করা হয়েছে তাঁর ছাত্র শায়খ হাইসাম সাইফ আদ-দ্বীনের বক্তব্য থেকে।]

https://www.facebook.com/HaythamSayfaddeen/posts/942657325789361

https://www.facebook.com/HaythamSayfaddeen/posts/943277862393974

ইন শা আল্লাহ্ , শাইখের ফেইসবুক পেইজে সরাসরি শাইখকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে পারেন - https://www.facebook.com/HaythamSayfaddeen/

শাইখের ফেইসবুক আইডি - https://www.facebook.com/profile.php?id=100008941630687]

শাইখ সুলাইমান বিন নাসির আল-উলওয়ান ছাড়াও শাইখ আব্দুল আযীয ইবন মারযুক্ব আত-তারিফি, শাইখ আবু আইয়ুব আল-বারক্বাউয়ী এবং শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আল গুলাইফা একই মত ব্যক্ত করেছেন।

একইসাথে উল্লেখ্য ইবন ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে অপর একটি বর্ণনা আছে যা পুরোপুরিভাবে এই বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক। বর্ণনাটি নিম্নরূপ -

হাসান ইবনে আবি আর রাবিয়া আল জুরজানি [পূর্ণ নাম হল, ইবন ইয়াহইয়া ইবন জা'জ। ইনিও বর্ণনাকারী হিসেবে সত্যবাদী এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে গৃহীত] বর্ণনা করেছেন, আমরা আব্দুর রাযযাক থেকে, তিনি মুয়াম্মার থেকে, তিনি ইবনে তাউস থেকে, এবং তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন-

ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করা হল আল্লাহর এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে, "...।আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুসারে যারা বিচার-ফায়সালা করে না, তাঁরাই কাফির।"[আল-মায়'ইদা, ৪৪]

জবাবে ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "কুফরের জন্য এটাই যথেষ্ট।" [আকবার উল কাদ্দাহ, খণ্ড ১, পৃ৪০-৪৫, ইমাম ওয়াকিয়া। বর্ণনাকারী হলেন মুহাম্মাদ ইবন খালাফ ইবন হাইয়্যান, যিনি পরিচিত ওয়াকিয়া নামে। তিনিই আখবার উল ক্বাদা কিতাবটি রচনা করেছেন। ইবন হাজার আল-আসক্বালানীম আল-খাতিবি এবং ইবন কাসির – তাঁদের সকলের উপর আল্লাহ্ রহম করুন – ওয়াকিয়ার ব্যাপারে বলেছেন, "সে বিশ্বাসযোগ্য"]

যখন ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, "কুফরের জন্য এটাই যথেষ্ট", তখন আর এটাকে ছোট কুফর বলে গণ্য করা যাবে না। যেহেতু তিনি "যথেষ্ট" বলেছেন, তাহলে বোঝা যাচ্ছে তিনি এখানে বড় কুফর (কুফর আকবরকেই) বোঝাচ্ছেন।

২। ইব্রাহীম ইবন আল-হাকাম ইবন যাহির তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বর্ণনা করেছেন আস-সুদ্দাই থেকে যিনি বলেছেন, ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেনঃ

"যে বিচারের ক্ষেত্রে জেনেশুনে স্বেচ্ছাচারিতা করে (অর্থাৎ নিজের ইচ্ছেমতো বিচার করে), জ্ঞান ছাড়া বিচার করে, কিংবা বিচারের ব্যাপারে ঘুষ গ্রহণ করে, সে কাফিরের অন্তর্ভুক্ত।" [আখবার উল ক্বুদা, পৃঃ ৪১]

এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল- কুফর দুনা কুফরের সনদ সম্পর্কে কোন মতামত দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য না, এবং আমাদের এ লেখার লক্ষ্যও এটা না। আমাদের উদ্দেশ্য হল এ উক্তিটির সনদের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে যে মতপার্থক্য আছে, শুধুমাত্র তা উল্লেখ করা এবং পাঠককে জানানো। এ উক্তির সনদের গ্রহণযোগ্যতা এবং সনদ নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী পাঠক শাইখ হাইসাম সাইফ আদ্ব-দ্বীনের পেইজে এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

যদি কুফর দুনা কুফরের সনদ সহিহ হয়ঃ

একইসাথে অনেক মুহাদ্দিসিন "কুফর দুনা কুফর" উক্তিটির সনদ গ্রহণযোগ্য। যেহেতু আমাদের পক্ষে সঠিকভাবে এ বিষয়ে নিশ্চয়তার সাথে কোন সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব না, সেক্ষেত্রে আমাদের দুটি সম্ভাবনাকেই বিবেচনা করা উচিত। যেহেতু এ বিষয়টি – অর্থাৎ "কুফর দুনা কুফর" উক্তিটির সনদ সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে – সেহেতু যদি ধরে নেওয়া হয় "কুফর দুনা কুফর" –এর সনদ সাহীহ তবুও কি এটা ঢালাও ভাবে আল-মায়'ইদার ৪৪ নম্বর আয়াতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে? শুধুমাত্র এই একটি বর্ণনার ভিত্তিতে কি বলা যাবে, শারীয়াহ ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসন করা ছোট কুফর, এবং এমন কুফর করলে ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হবে না? অন্যান্য আয়াত থেকে আমরা এ বিষয়ে যা জানতে পেরেছি তা কি শুধুমাত্র এই একটি উক্তির কারণে রহিত হয়ে যাবে? যদি তাই হয়, তবে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর ফিকহবিদগণ, মুফাসসিরগণ, 'উলামাগন কিভাবে এই ঐক্যমতে (ইজমা) পৌছালেন যে আল্লাহর আইন দ্বারা শাসন না করা ব্যক্তি কাফির? ইতিমধ্যে এই ইজমার অসংখ্য প্রমাণ আমরা দেখেছি। যদি আমরা ধরে নেই "কুফর দুনা কুফর" – এর সনদ সাহিহ, সেক্ষেত্রে কিভাবে এই বক্তব্য এবং উলামাদের ইজমার মধ্যে সমন্বয় হবে? দুটি অবস্থা কি সাংঘর্ষিক হয়? আপাত দৃষ্টিতে এমনটা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা এমন না। এজন্য আমাদের তাকাতে হবে কুফর দুনা কুফরের সঠিক ব্যাখ্যার দিকে।

কুফর দুনা কুফরের সঠিক ব্যাখ্যাঃ

কুফর দুনা কুফরের ব্যাখ্যায় অতীতের এবং সমসাময়িক উলামার বক্তব্য তুলে ধরা হলঃ

শাইখ আব্দুল আযীয আত-তারিফিঃ

"(ধরুন) কোন ভূমিতে আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তা হালাল আর আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা হারাম। পরে দেখা গেল কিছু কিছু ক্ষেত্রে শাসক আল্লাহর আইন প্রয়োগ করার ব্যাপারে ব্যর্থ হচ্ছে। সে আল্লাহর হালাল করা কোন বিষয়কে হারাম ঘোষণা করছে না, কিংবা আল্লাহর হারাম করা কোন বিষয়কে হালাল ঘোষণা করছেনা। তবে কিছু ক্ষেত্রে সে শারীয়াহর বিধান প্রয়োগ করছে না। যেমন সে হয়তো মদপানকারী বা যিনাকারীকে শাস্তি দিচ্ছে না, অথবা সে ঘুষ নিয়ে চোরকে শাস্তি দিচ্ছে না, যদিও এগুলো এসব অপরাধের শারীয়াহ নির্ধারিত শাস্তি [অর্থাৎ ঢালাওভাবে চুরির শাস্তি হাতকাটা, বা যিনাকারির রযম বন্ধ করা হচ্ছে

না, কিছু ক্ষেত্রে শাসক ও বিচারক দুনিয়াবি কারণে এগুলো প্রয়োগ করছে না]। এক্ষেত্রে তার ব্যাপারে বলা যায় এটা হল "কুফর দুনা কুফর [কুফর যা কুফর আকবর না], যা সালাফদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু যদি ব্যাপারটা হয় শারীয়াহ দ্বারা শাসন না করা, তবে এ নিয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে এ হল মুসলিমদের ইজমা অনুযায়ী কুফর আকবর। কিছু মানুষ কুফর দুনা কুফরের নীতি প্রয়োগ করতে চায় – (আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য) আইন প্রণয়নের ব্যাপারে (তাশরী') । এটা কি গ্রহণযোগ্য? কোন মুসলিমের কাছেই এটা গ্রহণযোগ্য না। বরং এ কারণেই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শাসকের প্রতি আনুগত্যকে সংযুক্ত করেছেন শাসকের আল্লাহর শারীয়াহ দ্বারা শাসন করার সাথে। যেমনটা নাবী কারীম ﷺ বলেছেন – "যদি তোমাদের উপর কোন হাত পা কাটা গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয় আর সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুসারে পরিচালিত করে তবে তোমরা তার কথা শুনবে এবং মানবে।" [সাহীহ মুসলিম, হাদীস নম্বর ৪৬১০]

সুতরাং শাসকের প্রতি আনুগত্য সরাসরি যুক্ত করা হয়েছে আল্লাহর কিতাবের সাথে এবং 'আম ভাবে ক্ষমতায় যেই আসুক তার আনুগত্য করার কথা বলা হয় নি।

[https://www.youtube.com/watch?v=xgZjOP4ShOw]

শাইখ আব্দুল্লাহ আল-গুনায়মানঃ

ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে যে উক্তি (কুফর দুনা কুফর) বর্ণিত হয়েছে সেটা ঢালাও ভাবে আল্লাহ্ জাল্লা ওয়া 'আলার এই আয়াতের ব্যাপারে প্রযোজ্য না - '...যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।'

এটা সম্ভবই না যে আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকে কাফির বলে ঘোষণা দেবেন আর আমরা তারপর বলবো, "না এটা কুফর না।" ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর উক্তিটি ব্যবহার করা যায় বিশেষ ও নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে, যখন বা তার কাছকাছি সংখ্যক কিছু ক্ষেত্রে শাসক বা বিচারক আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী শাসন না করে অন্য কিছু দিয়ে শাসন করে। কিন্তু সে শারীয়াহকে স্বীকার করে, এবং এও স্বীকার করে যে শারীয়াহ দ্বারা শাসন না করে সে ভুল করেছে এবং তার শাস্তি পাওয়া উচিৎ। এ ধরণের ব্যক্তির ব্যাপারে ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন তার কুফর হল "কুফর দুনা কুফর"। কিন্তু যখন

কেউ ইসলামী শারীয়াহকে প্রতিস্থাপিত করে মানবরচিত আইন দিয়ে, কিংবা সে শারীয়াহর উপর অন্য কোন বিধানকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেয় – তখন তার ব্যাপারে কুফর দুনা কুফর বলা অসম্ভব। কারণ প্রকৃত পক্ষে তার কুফর হল সেই পর্যায়ের কুফর যার ব্যাপারে আল্লাহ্ জাল্লা ওয়া 'আলা বলেছেন –"...যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।"

এছাড়া এর আগে আমরা এ আয়াতের কথা আলোচনা করেছি - "আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে..." [আন নিসা, ৬০]

আর তারপর আল্লাহ্ আমাদেরকে ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন এই লোকগুলো, "...তারা তাদের মোকদ্দমা তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়..." [আন নিসা, ৬০]। অতএব এ থেকে আমরা বুঝতে পারি তাগুতের কাছে যে (আল্লাহর বিচারের পরিবর্তে) তাগুতের বিচার চাইবে তার ইমান থাকবে না। তারপর আল্লাহ্ এসব লোকের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন এবং তারপর বলেছেন –

"অতএব, আপনার রাব্বের কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক বলে গ্রহণ না করে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।" [আন-নিসা, ৬৫]

এই আয়াতের শারীয়াহর দ্বারা বিচারের ব্যাপারে কিছু শর্ত উল্লেখ করা হয়েছেঃ আল ইনক্বিয়াদ [আনুগত্য প্রদর্শন], আর-রিদ্বা [অন্তরে সন্তুষ্টি] এবং তাসলীম [সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন] করা শারীয়াহর বিচারের প্রতি। যদি এই শর্তগুলোর কোন একটি কারো মধ্যে অনুপস্থিত থাকে, তবে সে ব্যক্তি মু'মিন হতে পারবে না। তাহলে যে শাসন করছে মানব রচিত আইন দিয়ে, তার ব্যাপারে কিভাবে বলা যাবে এটা কুফর দুনা কুফর? এটা সম্ভবই না যে ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এরকম শাসকের ব্যাপারে কুফর দুনা কুফর বলেছেন। এবং কোন আলিম যে আল্লাহ্ যা বলছেন ও তাঁর নাবী ﷺ যা বলেছেন তা অনুধাবনে সমর্থ হয়েছে সে এরকম বলতে পারে না।

বরং ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এই উক্তি প্রযোজ্য বিশেষ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে। কোন ব্যক্তি যদি ২-১ টি, বা এরকম সংখ্যক কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী বিচার করা থেকে বিরত থাকে, দুনিয়াবী লোভ কিংবা প্রমোশন কিংবা চাকরি হারানো ভয়ে, সেক্ষেত্রে তার ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে তা কুফর দুনা কুফর (কুফর যা কুফর আকবর না)।

[https://www.youtube.com/watch?v=wTVgOQWfuqU –]

ইমাম ইবন কাইয়্যিমঃ

আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী শাসন না করার ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে দুই ধরনের কুফর হয়ে থাকে, কুফর আসগার ও কুফর আকবার। যদি শাসক শারীয়াহ দ্বারা শাসনের আবশ্যকতা স্বীকার করা সত্ত্বেও কোন একটি ক্ষেত্রে শারীয়াহ দ্বারা বিচার করা ত্যাগ করে, এবং স্বীকার করে তার এই কাজ গুনাহ, এবং এর জন্য সে শাস্তি পাবার যোগ্য, এবং এজন্য সে ক্ষমা চায় – তবে এটা হল কুফর আসগর। যদি সে মনে করে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছে তদানুযায়ী শাসন করা ফরয না, এবং সে নিজের ইচ্ছে মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে, অথচ সে জানে আল্লাহ্ হচ্ছে আল-হাকিম, যদি সে এই বিশ্বাসে পতিত হয় তবে তা কুফর আসগর। [বাদ'আ আত-তাফসির ২/১১২]

মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীমঃ

সবশেষে আল-'আল্লামা ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীমের কুফর দুনা কুফর সংক্রান্ত ব্যাখ্যা থেকে এ ব্যাপারে বিভ্রান্তির কোন অবকাশই থাকে না। যারা মনে করেন যাদের বড় পদ নেই তারা 'আলিম হিসেবে গ্রহণযোগ্য না, তাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম ছিলেন বিন বাযের আগে সাউদী আরবের গ্র্যান্ড মুফতি এবং ছিলেন বিন বায, ইবন জিব্রিন সহ অনেকের শিক্ষক। আপোষহীন এই মহান শাইখ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার ছাত্রদের তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ শিখিয়ে গেছেন এবং জনসাধারনের কাছে এ সত্য তুলে ধরেছেন। যারা বলতে চান তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহর ব্যাপারে দাওয়াহ দেওয়া বিদ'আ, আমরা তাদের আহবান জানাই মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীমকে বিদ'আতী আখ্যায়িত করার জন্য।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম রাহিমাহুল্লাহ কুফর দুনা কুফরের সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন -

"…কুফর দুনা কুফর হচ্ছে যখন বিচারক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছু দিয়ে বিচার-ফায়সালা করে এই দৃঢ় প্রত্যয় যে, এটা হচ্ছে কুফরী। সে বিশ্বাস করে যে আল্লাহর বিধান হচ্ছে সত্য কিন্তু কোন কারণে সে তা পরিত্যাগ করেছে। এরই পরম্পরায় যে

আইন তৈরি করবে এবং অন্যদের এটা অনুসরণ করতে বাধ্য করবে, তখন সেটা কুফর (কুফর আকবর হবে)। যদিও সে একথা বলে, 'আমরা গুনাহ করছি এবং নাযিলকৃত বিধানের বিচার ফায়সালা বেশি উত্তম'। তা সত্ত্বেও এটা কুফর যা দ্বীন থেকে বের কর দেয়।" [মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীমের মাজমু'আ ফাতাওয়া, খন্ড ২১, পৃঃ ৫৮০]

শাইখের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট "কুফর দুনা কুফর" তখনই প্রযোজ্য যখন ব্যাপারটা কয়েকটি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান ব্যাতীত অন্য কিছু দ্বারা বিচার করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এটা প্রযোজ্য হয় ঐ শাসকের জন্য যে সাধারনভাবে শারীয়াহ দিয়েই শাসন করে, কিন্তু হাতেগোণা দু-একটি ঘটনায় সে এর ব্যতিক্রম করে। অবশ্যই সে মনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে শারীয়াহর শ্রেষ্ঠত্ব এবং শারীয়াহ দ্বারা শাসনের আবশ্যকতা। অর্থাৎ "তাহাকিম" বা বিচারের ক্ষেত্রে যদি কেউ অল্প কিছু ক্ষেত্রে শারীয়াহ ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা বিচার করে তবে তাকে কাফির বলা যাবে না, এটা কুফর দুনা কুফর। কিন্তু যখনই ব্যাপারটা তাশরী'-র পর্যায়ে অর্থাৎ "আইন প্রনয়ণের" পর্যায়ে প্রবেশ করবে, তখনই সেটা কুফর আকবর হবে। যদি সেটা একটি আইনের ক্ষেত্রেও হয়। যদি শারীয়াহর একটি আইন কোন শাসক পরিবর্তন করে, সে যদি অন্য সব বিষয়ে শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে, তবে সেটাই কুফর আকবর হবার জন্য যথেষ্ট। কারণ কেউ যদি ক্কুর'আনের একটি আয়াত অস্বীকার করে, আর বাকি সব স্বীকার করে তবে সে কাফির। পাঠক এখন চিন্তা করে দেখুন বর্তমান সময়ের শাসকদের কুফর কি শুধুমাত্র তাহকিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি তারা যথেচ্ছভাবে আইনও প্রণয়ন করে? মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে শাসন করা হয় মানবরচিত সংবিধান দ্বারা যেখানে খোলাখুলি ঘোষণা করে হয় সংবিধান সর্বোচ্চ আইন, যা কিছু সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক তা বাতিল বলে গণ্য হবে – তাহলে কিভাবে এক্ষেত্রে কুফর দুনা কুফর প্রযোজ্য হতে পারে? এমনকি আরব উপদ্বীপের যেসব ভূমি শারীয়াহ দ্বারা শাসিত হয় বলে দাবি করা হয়, সেখানেও রিবাকে বৈধতা দেওয়া হয় এবং অন্যান্য আইন পাশ করা হয় যা শারীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক। অর্থাৎ সেখানেও বিষয়টা তাহকিম বা কিছু ক্ষেত্রে শারীয়াহ অনুযায়ী বিচার না করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তাশরী' অর্থাৎ আইন প্রনয়নের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আর এটা কুফর দুনা কুফর না বরং কুফর আকবর – যা আল্লাহর কিতাব ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

এর পরও কিভাবে "কুফর দুনা কুফর"-এর অজুহাত দিয়ে শাসকদের বৈধতা দেওয়া যেতে পারে? শুধুমাত্র আরব উপদ্বীপের শাসকদের না (যেহেতু এ শাসকরা অনেক ক্ষেত্রেই শারীয়াহ অনুযায়ী বিচার করে, তাই আমরা তাদের ক্ষেত্রে যারা বিভ্রান্তিতে পড়েছে তাদের কথা আপাতত ছেড়ে দিলাম) বরং মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য শাসকদেরকেও, যারা বিচার করছে ব্রিটিশ-ফ্রেঞ্চ-জাতিসংঘের আইন আর নিজ নিজ জাহেলি সংস্কৃতির সংমিশ্রনে তৈরি জগাখিচুড়ি সংবিধান দিয়ে, যেগুলোর সাথে আল্লাহ্‌ আল-হাকাম ওয়াল হাকীমের শারীয়াহর দূরতম কোন সম্পর্ক নেই?

"তোমাদের কি হল? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ?" [আল-ক্বালাম, ৩৬]

যদি তর্কের খাতিলে ধরে নেওয়া হয় ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু- ঢালাওভাবে শারীয়াহ পরিবর্তনকারী সকল শাসকের ব্যাপারে এ উক্তি করেছিলেন, তবুও কি এই উক্তি দ্বারা আদৌ আজকের শাসকদের বৈধতা দেয়া যায়?

যদি তর্কের খাতিরে, ইবন মাসুদ রাদীয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য উপেক্ষা করে, খোদ ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অন্য বক্তব্য উপেক্ষা করে, কুফর দুনা কুফর সম্পর্কিত যে ভিন্ন বর্ণনা আছে তা উপেক্ষা করে, রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে তিন ধরনের বিচারকের মধ্যে দু ধরনের বিচারকের জাহান্নামী হবার হাদিস উপেক্ষা করে, ইবনা আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহুর বক্তব্য এবং এ ব্যাপারে উলামা এবং ফাক্বিহগণের ইজমা উপেক্ষা করে, হাকিমিয়্যাহ এবং আল্লাহ-র আইন ব্যতীত অন্য আইন দ্বারা শাসন কুফর হওয়া সম্পর্কিত অন্য সকল আয়াত উপেক্ষা করে যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় যে ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি “কুফর দুনা কুফর” – সম্পর্কে সালাফি নামধারী কিছু বর্তমান সময়ের কিছু উলামা এবং দা’ঈ যে নব উদ্ভাবিত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যা প্রায় ১৪০০ বছর ধরে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা’আর কেউ দেয়নি – অর্থাৎ ইবন ‘আব্বাস রাড্বিয়াল্লাহু আনহুর কথার অর্থ ছিল সূরা মায়’ইদার ৪৪ নম্বর একটি বিশেষ অবস্থায় নাযিল হয়েছে, এটা ‘আম ভাবে (সাধারণভাবে প্রযোজ্য না) কিংবা এ আয়াতে একটি নির্দিষ্ট ধরনের কুফরের কথা (ছোট কুফর) বলা হয়েছে বড় কুফর না, সেক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয়?

এ ব্যাপারে প্রথমত, শাইখ সালিহ ইবন উসাইমিন (যিনি নিজেদেরকে সালাফদের অনুসরণকারী নব্য-সালাফিদের একজন প্রিয় ‘আলিম ও তাদের কাছে সম্মানিত) এর একটি উদ্ধৃতি আমি তুলে ধরছি যা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য –

“একজন সাহাবার বক্তব্যের কোন অধিকার নেই আল্লাহ্ যা ‘আম করেছেন, তা খাস করার।”

[আল উসুলু মিন ‘ইলম ইল-উসুল, পৃ ৩৩-৩৪]

প্রকৃত পক্ষে এটি ফিকহের একটি প্রসিদ্ধ নিয়ম, যার উপর সকল ফাক্বিহগণ একমত। আর তা হল কোন আয়াত যা ‘আম ভাবে নাযিল হয়েছে, তার প্রয়োগ ঐ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট দ্বারা সীমাবদ্ধ হবে না। ‘আল্লামা আশ শাতিবি রাহিমাহুল্লাহ তার কিতাব আল-মুওয়াফিক্বাত এবং আল’ইতিসামে এই মূলনীতিটি উল্লেখ করেছেন -

.

العام لا يقصر على سببه

.

“যা ‘আম তা নাযিলের কারন/প্রেক্ষাপট (আসহাব উন নুযুল) দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যাবে না।”

সকল আহকামের আয়াতের ক্ষেত্রেই (যা পরবর্তীতে অন্য আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে সেগুলো ছাড়া) এই নীতিটি প্রযোজ্য, এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময়কাল থেকেই এটা মেনে চলা হচ্ছে। কারণ সকল আহকামের আয়াতই, কোন না কোন নির্দিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষিতেই নাযিল হয়েছিল, কিন্তু তার মানে এই না যে সে আহকাম গুলো নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে বা নির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য প্রযোজ্য। অন্যদের জন্য না। বরং সকল মুসলিমই একমত যে এগুলো ‘আমভাবে বা সাধারণভাবে প্রযোজ্য। একমাত্র যারা গোমরাহিতে আপতিত এবং বাতিল ফিরকাগুলো ছাড়া আর কেউ এ ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে না।

সুতরাং যা ক্কুর’আন থেকে সুস্পষ্টভাবে কুফর হিসেবে প্রমাণিত, হাদিস থেকে প্রমাণিত, অন্য সাহাবার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উক্তি থেকে এবং আলোচ্য সাহাবার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অন্য উক্তি থেকে প্রমাণিত তার বিরুদ্ধে গিয়ে এই উক্তির এরকম অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। আর প্রকৃত সত্য হল, ইবন ‘আব্বাসের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে যা আরোপ করা হচ্ছে [অর্থাৎ শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে, শারীয়াহ বিরোধী আইন তৈরি করে এমন শাসককের কুফরকে তিনি ছোট কুফর বলেছেন] তা থেকে তিনি মুক্ত। বরং এই ব্যাখ্যা একটি নব উদ্ভাবিত ব্যাখ্যা যা সেসব লোকেরা উদ্ভাবন করেছে যারা দুনিয়ার বিনিময়ে তাদের দ্বীনকে বিক্রি করে দিয়েছে। আর এজন্য তারা সাইয়্যিদিনা ইবন ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর একটি বিশেষ অবস্থায় হারুরিয়্যাহ খারেজিদের উদ্দেশ্যে বলা একটি বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করছে। খারেজিরা নিরপেক্ষ শারীয়াহ আদালত মেনে নেবার কারণে আলী, মু’আবিআ, ‘আমর ইবনুল ‘আস এবং আবু মুসা আল-আশারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইনের উপর তাকফির করছিল।তাদের বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য, নিরপেক্ষ শারীয়াহ আদালত স্থাপন ও তার বিচার মেনে নেবার যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সূরা মায়’ইদার ৪৪ নম্বর আয়াতকে দালীল হিসেবে ব্যবহার করে খারেজিরা একে কুফর বলছিল। সাইয়্যিদিনা ইবন আব্বাস রাদীয়াল্লাহু আনহুর উক্তিটি ছিল এই প্রেক্ষাপটে। এর সাথে আজকের শাসকদের অবস্থার, আজকের পরিস্থিতির কি মিল আছে? বরং যারা “কুফর দুনা কুফর” উক্তিটিকে শাসকদের বৈধতা দেয়ার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছেন তারাই প্রকৃতপক্ষে একটি বিশেষ অবস্থায় বলা খাস উক্তিকে ‘আম ভাবে ব্যবহার করতে চাচ্ছেন। আর যদি সব দালীল প্রমানের বিরুদ্ধে গিয়ে আমরা ধরে নেই ইবন ‘আব্বাস এই অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তবে আমাদের মনে রাখতে হবে নাবী-রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম ছাড়া আর কোন মানুষই ভুলের ঊর্ধ্বে নন, আর আল্লাহ-র কিতাবের বিপরীতে গিয়ে কোন সৃষ্টির ভুলের উপর কোন অনুসরণ নেই।

যারা সমস্ত দালীল-প্রমানের বিরুদ্ধে গিয়ে এ বাতিল অবস্থানের উপর অটল থাকার জেদ ধরেন এবং এর মাধ্যমে শাসকদের বৈধতা প্রমাণের চেষ্টা করেন, তাদের জন্য আল্লামা আহমেদ শাকিরের এ কথাগুলোই যথেষ্ট হওয়া উচিতঃ

কুফর দুনা কুফরের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আহমেদ শাকিরের বক্তব্য এবং হুশিয়ারিঃ

"আবু মাজলিয এবং ইবন 'আব্বাসের প্রতি খারেজিদের প্রশ্ন আজকের যুগের বিদ'আর মত ছিল না, যেখানে আইন প্রণয়ন এবং মানুষের জান-মাল-সম্পদের ব্যাপারে বিচার করা এমন আইন দিয়ে যা আল্লাহর শারীয়াহর বিরোধী।...এধরণের কাজ হল আল্লাহ্‌ র বিচার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, তাদের আল্লাহর সৃষ্টির আইনের জন্য। এটা হল কুফর, আর যারা মাক্কার দিকে ইবাদাত করে [অর্থাৎ আহলুল ক্বিবলা, যারা 'কবার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করে – মুসলিমরা] তাদের কারো মধ্যে এ কাজের কুফর হওয়া নিয়ে সন্দেহ নেই।

আর আজ আমরা [মুসলিমরা] যেখানেই অবস্থান করি না কেন, সবজায়গাতেই আল্লাহ্‌ র বিধানসমূহকে ত্যাগ করা হচ্ছে, কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই। তাঁর কিতাবে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহতে যে বিধানাবলী দেওয়া হয়েছে, তা ছেড়ে আজ আমরা অন্য বিধান গ্রহণ করছি, এবং শারীয়াহকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করছি।

যারাই ইবন আব্বাস ও আবু মাজলিযের বক্তব্য [কুফর দুনা কুফর] ব্যবহার করে, সেগুলোর প্রেক্ষাপট বদলে দিয়ে আল্লাহর শারীয়াহ ব্যাতীত অন্য কিছু দিয়ে শাসন করাকে ইসলামে বৈধতা দিতে চায় [অর্থাৎ "কুফর দুনা কুফর" উক্তিটিকে ব্যাবহার করে শারীয়াহ ব্যাতীত অন্য কিছু দিয়ে শাসন করাকে বৈধ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে], শাসকদের নৈকট্য অর্জন করতে চায়, এরকম ব্যক্তি আল্লাহ্‌ র বিধান অস্বীকারকারী। তাকে অবশ্যই তাওবাহ করতে হবে। যদি সে তাওবাহ করে, তবে তার [অর্থাৎ যে শারীয়াহর অপব্যাখ্যার মাধ্যমে শারীয়াহ ব্যাতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসনের বৈধতা দিতে চাওয়া] কাজ ছোট কুফর গণ্য করা হবে। আর যদি সে তাওবাহ না করে, এবং তার এই বক্তব্যের উপর অটল থাকে এবং (শাসকদের) এসব বিধানকে গ্রহণ করে, তবে এটা তো সবার জানা কুফরের উপর অটল থাকা কাফিরের সাথে কিভাবে বোঝাপড়া করতে হয়।" [তাখরীজ আত-তাবারী, খন্ড ১০, পৃ ৩৪৯-৩৫৮]

তাগুতকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করার আবশ্যকতা

আল্লাহ্‌ 'আযযা ওয়া জাল আমাদের বলেছেন –

“সুতরাং যারা তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙবার নয়।” [আল-বাক্বারাহ, ২৫৬]

“আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক।” [সুরা আন-নাহল, ৩৬]

তাওহীদের বা এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনের দুটি রুকনের প্রথমটি হল, “কুফর বিত-তাগুত” বা তাগুতকে অস্বীকার। আর দ্বিতীয় রুকনটি হল এবং “ইমান বিল্লাহ” – অর্থাৎ আল্লাহর উপর বিশ্বাস। বিশ্বাসী হবার জন্য প্রথমে আমাদের আল্লাহ্‌ ব্যাতীত আর সব মিথ্যা ইলাহকে অস্বীকার করতে হবে, প্রত্যাখ্যান করতে হবে, তাদের উপর অবিশ্বাস করতে হবে, এবং তারপর একমাত্র ইলাহ হিসেবে, ইবাদাত ও আনুগত্যের যোগ্য একমাত্র সত্ত্বা হিসেবে একমাত্র আল্লাহ্‌ কে গ্রহণ করতে হবে। যেকোন একটি যদি বাদ থাকে তাহলে ইমান থাকবে না।

প্রশ্ন হল, তাগুত কি?

তাগুত শব্দটির শব্দের উৎপত্তি “ত্বঘইয়্যান” থেকে, যার শাব্দিক অর্থ হল “যথাযথ ভাবে নির্ধারিত যে সীমা, তা লঙ্ঘন করা”।

শারীয়াহতে তাগুত বলতে বোঝানো হয় – এমন কেউ যে সীমালঙ্ঘন করে যেসব বিষয় শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ 'আযযা ওয়া জালের অধিকার এবং এখতিয়ারভুক্ত তা নিজের জন্য দাবি করে এবং আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে নিজেকে অংশীদার দাবি করে।

আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদের বা যা কিছু ইবাদাত, আনুগত্য, অনুসরণ এবং যাদের বা যা কিছুর প্রতি সমর্পণ করা হয় তার সবই তাগুত। ইমাম মালিক বলেছেন “আল্লাহ্‌ ব্যাতীত যা কিছুর ইবাদাত করা হয় তাই তাগুত।” [তাফসীর ইবন কাসির, সূরা বাক্বারার ২৫৬

নম্বর আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য]

ইতিপূর্বে আমরা শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ তাগুতের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা উল্লেখ করেছি, পাঠকের সুবিধার্থে তা এখানে আবার উল্লেখ করা হল -

“আল্লাহ্ র কাছে গ্রহণযোগ্য না এমন কাজে আল্লাহর অবাধ্যতায় যার আনুগত্য করা হয়, সে হল তাগুত। যদি আপনি আল্লাহ্ যা জানিয়েছেন তার পরিবর্তে, এ ব্যক্তি/সত্ত্বার বক্তব্য গ্রহণ করেন যা আল্লাহ্ আমাদের যা জানিয়েছেন তার সাথে সাঙ্ঘর্ষিক, কিংবা যদি আল্লাহর আদেশের বিপরীতে এই ব্যক্তি/সত্ত্বার আদেশ মানা হয় – তবে সে তাগুত। একারণে কোন যে ব্যক্তিকে বিশ্বাসীদের মধ্যে বিচার ফায়সালার জন্য নিযুক্ত/নির্ধারন করার পর সে আল্লাহর আইনের বদলে অন্য কোন আইন দ্বারা শাসন করে, তাকে আল্লাহর কিতাবে তাগুত আখ্যায়িত করা হয়েছে।” [মাজমু’ আল ফাতাওয়া, খন্ড ২৮, পৃঃ ২০১]

ইবনুল কাইয়্যিম মাদারিয আস সালিকিনে তাগুতের সংজ্ঞা এবং প্রকারভেদের ব্যাপারে বলেছেন-

“তাগুত হল মিথ্যা বিধানদাতা। এই বিধান ইবাদাতের ক্ষেত্রে হতে পারে, শাসনের ক্ষেত্রে হতে পারে, বিচারের ক্ষেত্রে হতে পারে, আক্বিদার ক্ষেত্রে হতে পারে।অর্থাৎ, তাগুত সে, যে এমন আইন,বিধান, ইবাদাত প্রণয়ন করে যা আল্লাহ্ বনী আদমের জন্য নির্ধারিত করেন নি, এবং যেগুলো আল্লাহ্ যা নাযিল করেছন সেগুলোর বিরোধী। তাগুত শব্দের উৎপত্তি “ত্বাঘইয়্যান” থেকে, যার অর্থ হল “যথাযথ ভাবে নির্ধারিত যে সীমা, তা লঙ্ঘন করা।”

তাগুত সিস্টেম হিসেবে তিন ভাবে প্রকাশ পেতে পারেঃ

১। আইন প্রনয়ণের ক্ষেত্রে

২। ইবাদাতের ক্ষেত্রে

৩। আনুগত্যের ক্ষেত্রে

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহর মতে তাগুতের পাঁচটি প্রধান প্রকার আছেঃ

১। ইবলিস

২। আল্লাহ্ ব্যতীত যার ইবাদাত করা হয়, এবং সে এতে সন্তুষ্ট [খ্রিষ্টানরা 'ঈসা আলাইহিস সালামের ইবাদাত করলেও একারণে তিনি তাগুত বলে গণ্য হবেন না]

৩। যে মানুষকে আহবান জানায় তার ইবাদাত করার জন্য [ফির'আউন, নমরুদ]

৪। যে দাবি করে তার কাছে গাইবের 'ইলম আছে [পীর, সাহির, ভবিষ্যৎবক্তা]

৫। যে আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী শাসন না করে, অন্য কিছুর ভিত্তিতে শাসন করে। ["শাসকের আনুগত্য করতে হবে??!!!"]

এব্যাপারে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা হল শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাবের ব্যাখ্যা যা তিনি মা'আনাহ আত-তাগুতে উল্লেখ করেছেন। যখন দ্বীনের এই মৌলিক বিষয়টি – অর্থাৎ কুফর বিত-তাগুত নিয়ে মানুষের মধ্যে ব্যাপক বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল, আল্লাহর ইচ্ছায় শাইখ তখন হাক্ব সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরার এবং কোন ভয়ভীতি ছাড়া হাক্বের প্রতি আহবানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আল্লাহ্ যেন এই মহান ইমাম এবং মুজাদ্দিদের উপর রহম করেন।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব বলেনঃ

১. প্রথম প্রকারের তাগুত হল ইবলিসঃ সে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতের দিকে আহব্বান করে।

২. দ্বিতীয় প্রকারের তাগুত হল স্বেচ্ছাচারী বিচারক যে আল্লাহ্‌ র বিধানকে পরিবর্তন করে। এর পক্ষে দালীল হল আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই আয়াতঃ

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবর্তীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবর্তীণ হয়েছে। তারা তাদের মোকদ্দমা তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়...." [আন নিসা, ৬০]

৩. তৃতীয় প্রকারের তাগুত হল সে ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসন করে। আর এর দালীল হল আল্লাহ্‌ 'আযযা ওয়া জালের এই আয়াতঃ

"অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্যে গ্রহণ করো না, যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই কাফির।" [আল-মায়'ইদা, ৪৪]

৪. চতুর্থ প্রকারের তাগুত হলঃ যে "ইলমে গায়েব" বা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করে।

৫. পঞ্চম প্রকারের তাগুত হল আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত/পূজা/উপাসনা করা হয়, এবং এতে যে রাজী-খুশি থাকে। [আদ-দারার উস সুন্নিয়াহ ফিল আজ্বাবাত উন-নাজদিয়াহ, খন্ড ১, পৃঃ ১০৯-১১০]

শাইখুল মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাবের এই ব্যাখ্যা এবং প্রকারভেদ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। একারণে যারা নিজেদের শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব এবং তাঁর পূর্বে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এবং ইমাম ইবন কাইয়্যিমের - তাঁদের সকলের উপর আল্লাহ্‌ রহম করুন – অনুসারী দাবি করেন, তারাই যখন শাইখদের এ কথাগুলো ভুলে যান তখন সত্যি অবাক হতে হয়। পাঠক নিশ্চয় খেয়াল করে থাকবেন শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব তৃতীয় প্রকারের তাগুতের ব্যাপারে তার বক্তব্যের স্বপক্ষে দালীল হিসেবে এনেছেন সূরা মায়'ইদার ৪৪ নম্বর আয়াতকেই।

উপরের বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে শাসক আল্লাহর আইন দ্বারা শাসন করে না, এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর পরিবর্তে তার অনুসরণ করা হয় – সে কাফির তো বটেই তাগুতও। এটাই ইবন তাইমিয়্যাহ, ইবন কাইয়্যিম, ইবন আব্দুল ওয়াহহাবের বক্তব্য। আর যদি আমরা আইন প্রণয়নের দিকে তাকাই? যখন কোন শাসক কোন ব্যাপারে আল্লাহ্ আল-মালিক যে বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা পরিবর্তন করছে, আল্লাহ্ র আইনকে বাতিল বলে ঘোষনা করছে আর নিজ সৃষ্ট আইন মানাকে আবশ্যক করেছে তখনই সে সীমালঙ্ঘন করেছে এবং আনুগত্যের ব্যাপারে আল্লাহ্ আযযা ওয়া জালের পরিবর্তে নিজেকে বসিয়ে নিয়েছে। যখন আল্লাহ্ বলেছেন যিনার শাস্তি রযম আর শাসক যিনার শাস্তি হিসেবে রযমকে বাতিল করছে – যখন আল্লাহ্ বলেছেন রিবা হারাম, আর শাসক বলছে রিবা হারাম হবার বিধান বাতিল, ৭ বা ১০% পর্যন্ত রিবা হালাল, যখন আল্লাহ্ বলেছেন “ওয়ামা লাকুম লা তুক্বতিলিনা ফী সাবিলিল্লাহ” আর শাসক বলছে অমুক জায়গায় যদি কেউ যেতে চায় তবে আমরা তাকে বন্দী করবো, শাস্তি দেবো কারণ সে অপরাধী - তখন কি সেটা ছোট কুফর? তখন কি সে শাসক মুসলিম? নাকি সে তাগুত?

ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করুন, কেউ আপনাকে এসে বললো মাগরিবের আজ থেকে আর ৩ রাকাহ পড়া যাবে না, মাগরিবের সালাত এখন থেকে ১৩ রাকাহ পড়তে হবে। শুধু এটা বলেই সে ক্ষান্ত হল না, সে এটাকে আইন করে বাধ্যতামূলক করে দিল, এবং যারা তার অবাধ্যতা করে আল্লাহর বাধ্যতা করলো সে তাদের শাস্তি দেয়া শুরু করলো – এমন ব্যক্তি কি মুসলিম? তার আনুগত্য করতে হবে? সে তো তখনই কাফির হয়ে গেছে যখন সে মাগরিবের সালাত ৩ রাকাহ এটা অস্বীকার করেছে। আর যখন সে আল্লাহ্ যা নির্ধারিত করেছেন তা বাতিল দাবি করে নিজে থেকে কিছু এনেছে এবং তা আবশ্যক করেছে, আইন প্রণয়ন করেছে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে এবং মানুষ এতে তার আনুগত্য করেছে তখন সে তাগুতে পরিণত হয়েছে। যদি সে জানে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ এক্ষেত্রে ৩ রাকাহ নির্ধারন করেছে, তবে এটাই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে তার জন্য আর কোন অজুহাত নেই।

যদি কেউ ক্বু’রআনের একটি আয়াত অস্বীকার করে তবে সে সর্বসম্মতিক্রমে সে কাফির। যদি ইমান আনার পর কোন ব্যক্তি তা করে, তবে সে মুরতাদ। অথচ যারা পুরো শারীয়াহকে অস্বীকার করলো। নিজে অস্বীকার করার পর মানুষের জন্য শারীয়াহর অনুসরণ হারাম করে দিলো, শারীয়াহর প্রতি আহবান করাকে অপরাধ বলে আখ্যায়িত করলো, আল্লাহ্ র শারীয়াহর বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেদের শারীয়াহ তৈরি করলো, এবং তার অনুসরণ লোকেদের উপর ফরয করলো – তার কুফর ছোট কুফর? তার আনুগত্য করতে হবে? সারা দিন পীরপূজা শিরক, মাযারপূজা শিরক, কবরপুজা শিরক, মূর্তিপূজা শিরক বোঝালেন আর রাষ্ট্রীয় শিরকের ব্যাপারে এসে নিরব হয়ে গেলেন? পীর-কবর-মূর্তি-মাজারের ব্যাপারে গর্জন করলেন আর শাসকের ব্যাপার আসাতে গলা শুকিয়ে গেল? আল্লাহ্ র নবী ﷺ এর হাদিসের, নাবীর সাহাবার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ক্বাউলকে অপব্যাখ্যা শুরু করলেন? ক্বু’রআন কে পেছনে ছুড়ে দিলেন? “তোমরা কি তাদের ভয় পাও? আল্লাহ্ তোমাদের ভয়ের অধিক হক্বদার, যদি তোমরা মু’মিন হও।”

যেখানে আল্লাহ্‌ আমাদের বলেছেন তাগুতকে বর্জন করতে সেখানে তাগুতের আনুগত্যের প্রশ্নই আসে না। যারা এরকম বলছে তাদের মধ্যে যারা জাহেল তাদের অজ্ঞানতা তাদের জন্য ওজর। কিন্তু যারা জেনেশুনে, নিজেদের আহমাদ ইবন হানবাল, ইবন তাইমিয়্যাহ এবং ইবন আব্দুল ওয়াহহাবের পথের অনুসারী দাবি করেও, তাগুতের সংজ্ঞা জেনেও, উলামা-মুফাসসিরিন-মুহাদ্দিসিন-ফুক্বাহাগণের 'ইজমা সম্পর্কে জেনেও, নাওয়াক্বিদ আল-ইমান সম্পর্কে জেনেও, ঈমানের অর্থ হল অন্তরে বিশ্বাস, মুখে ঘোষণা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সাক্ষ্য – এসব জেনেও বলছেন এমন শাসকের আনুগত্য করতে যে আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি আয়াত, রাসূলুল্লাহর একটি সাহিহ হাদীস না, বরং সমস্ত শারিয়াহ অস্বীকার করে, সমগ্র শারীয়াহ অবৈধ ঘোষণা করে, বাতিল ঘোষণা করে, এবং আল্লাহ্‌র আইনের বিরুদ্ধে নিজের আইন তৈরি করে এবং সে আইন অনুযায়ী শাসন করে – শুধুমাত্র শাসকের অত্যাচারের ভয়ে, তাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং তাওবাহ করা। তাগুতের প্রতি আহবানকারী হবেন না। আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করবেন না। কিতাবের কিছু অংশকে গ্রহণ আর কিছু অংশকে ত্যাগ করবেন না। যদি আপনি দুর্বল হন, তবে চুপ থাকুন ইন শা আল্লাহ্‌ কিয়ামতের দিনে আপনার দুর্বলতা আপনার পক্ষে ওজর হিসেবে কাজ করবে, কিন্তু তাগুতকে বৈধতা দেবেন না, তাগুতের প্রতি আহবানকারী হবেন না, কাফির-মুরতাদের পক্ষালম্বনকারী হবেন না, আল্লাহর রাসূল ﷺ এর হাদিসের অপব্যাখ্যা করবেন না। মহান আল্লাহ্‌ 'আযযা ওয়া জালের এই বাণী স্মরণ করুন – "অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্যে গ্রহণ করো না।"

শাসকের আনুগত্য এবং শারীয়াহ দ্বারা শাসন সম্পর্কে শেষ কিছু কথা

এ ব্যাপারে উপসংহার হিসেবে শাইখ মুস্তাফা কামাল মুস্তাফা আবু হামযা আল-মাসরি ফাকাল্লাহু আশরাহর কিছু কথা তুলে ধরছিঃ

"শারীয়াহর অবস্থান হল, জনগণ আর শাসক চুক্তিবদ্ধ। ইসলামে যেকোন চুক্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই এমন দুটি পক্ষ থাকতে হবে যারা চুক্তিবদ্ধ হবে, পাশাপাশি আরেকটি পক্ষ থাকতে হবে, যে বা যারা এই চুক্তির সাক্ষী হিসেবে থাকবে। এক্ষেত্রে এই তিনটি পক্ষ হল, জনগণ, শাসক এবং সাক্ষী হিসেবে স্বয়ং আল্লাহ্‌ সুবহানহু ওয়া তা'আলা। চুক্তিতে অবশ্যই একটি মূল বিষয়বস্তু থাকবে, যার ভিত্তিতে চুক্তিটি সংঘটিত হবে। ইসলামে শাসক ও জনগণের মধ্যে এই চুক্তির মূল শর্ত তথা ভিত্তি হল শারীয়াহ [অর্থাৎ শারীয়াহ দ্বারা শাসন করা]। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল নিজে এই চুক্তির সাক্ষী।

এই চুক্তির মাধ্যমে শাসককে আল্লাহর পবিত্র বিধান এবং নির্দেশিকা যথাসম্ভব কায়েমের দায়িত্ব দেয়া হয়। আল্লাহ হচ্ছেন এক্ষেত্রে জনগণ এবং শাসক ও শরীয়াহর মধ্যে সেতুবন্ধন স্বরূপ; [অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব তথা জবাবদিহিতা এবং আনুগত্যের মাধ্যমে শাসক ও জনগণ একে অপরের সাথে যুক্ত] কারণ তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই এভাবে তাঁর দ্বীন এবং শারীয়াহকে সাজিয়েছেন, আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন, এবং তিনি এটা আনুগত্যের শপথের [সেই শাসকের প্রতি যে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করে] বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছেন, এবং যেটার জন্য তাঁর কাছ থেকে প্রতিদান আছে।

তিনি জনগণকে অনুমতি দিয়েছেন তাদের শাসক নির্ধারণ করার, যে শারীয়াহ কায়েম করবে। তিনি শাসককে আদেশ দান করেছেন আল্লাহর আইন দিয়ে মানুষকে শাসন করার। এক্ষেত্রে আল্লাহ দুনিয়াতে শাসককে অধিকার দিয়েছেন অবাধ্যদের শাসন করার [শাস্তি দেবার], যতক্ষন শাসক দুনিয়াতে আল্লাহর শারীয়াহ অনুযায়ী কাজ করছে। আল্লাহ জনগণকে সতর্ক করেছেন, শাসক যদি শরীয়াহ দিয়ে না শাসন করে তবে যেন সে শাসকের আনুগত্য না করা হয়। এবং এক্ষেত্রে শাসকের অন্ধ অনুসরণ হচ্ছে এমন একটি কাজ শিরক আকবর (বড় শিরক) বলে গণ্য হবে। জনগণ এবং শাসকের মধ্যে এই চুক্তিটিকে বলে বাই'য়াহ।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শাসক যদি শরীয়াহ দিয়ে শাসন না করে তাহলে বাই'য়াহর আর বৈধতা থাকে না, কারণ শাসক নিজেই এই ক্ষেত্রে চুক্তি ভঙ্গ করেছে। ইসলামী আইনে, জনগণকে এইরকম শাসককে পরিবর্তন করে ফেলতে হবে ন্যায় ব্যবস্থা এবং ইনসাফ [অর্থাৎ ইসলামী শারীয়াহ] প্রতিষ্ঠার জন্য। যদি জনগণ এমনটা করতে অস্বীকার করে, আর সেনাবাহিনীও শাসককে সমর্থন করে, তবে সে সম্পূর্ণ ভূমিটি দারুল হারব হয়ে যায়। আর এই অবাধ্যতার মাধ্যমে সৃষ্টি মালিকুল মুলক আল্লাহ্ আযযা ওয়া জালকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করে। বিশ্বস্ত তথা হক্বপন্থি 'আলিমদের উচিত তখন এই শাসককে মুরতাদ ঘোষণা করা, এবং এই শাসকের অনুগত দলকে আল্লাহর দৃষ্টিতে কাফির দল [তাইফাতুল কুফর, দলগতভাবে] ঘোষণা করা। এই দলের সকলেই আল্লাহ-র শত্রু নাএবং তাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা নিশ্চিতভাবে শুধু পাপী [আল্লাহ-র শত্রু না, ব্যক্তিগতভাবে]। জিহাদ তখন সকল মুসলিমের জন্য ফরয, যতক্ষণ না সঠিক শাসক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে এবং শারীয়াহ দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা হচ্ছে।

আপনারা আজকের শাসকদের দিকে তাকালে দেখবেন, এরা সবাই শাসন করছে চুক্তি সম্পূর্ণভাবে ভঙ্গ করে। শারীয়াহ দিয়ে আসন না করার কারণে তারা নিজেরাই এই চুক্তিকে বাতিল করে দিয়েছে। তারা কোন বৈধতা ছাড়াই শাসন করছে। তারা হয়ত আমাদের ভাষায় কথা বলে, আমাদের মতই হয়ত গায়ের চামড়া, এমনকি চাপে পড়লে সুবিধা অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহ থেকে হয়ত আমাদের মতই দলীল দেয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে তাদের ছুরিতে সর্বদা মুসলিমদের রক্তই লেগে থাকে, আর তাদের হাত সর্বদা কুফফারদের মিষ্টি খাওয়াতেই ব্যস্ত। এর পাশপাশি তাদের পক্ষ থেকে কুফফারকে দেয়া আরো অন্যান্য সুবিধা দেয়া তো আছেই, যেমন মুসলিমদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো কুফফারদের হাতে তুলে দেয়া, অথবা মুসলিম নারীদের পণ্য হিসেবে

কুফফারদের কাছে বিক্রি করে দেয়া। ইসলামের বিরুদ্ধে এই অনবরত যুদ্ধে এইসব প্রশাসনের কিছু দুনিয়ালোভী দরবারী কিছু শাইখ বা 'আলিমও আছে, এরা উৎসাহের সাথে যালিমের গুণগান করে বেড়ায়, আনুগত্য করতে বলে, আর শাসকের স্বপক্ষে ব্যালেট বক্সে ভোটও দেয়। এমনকি যদি শাসকরা গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, প্রকাশ্যেই কুফরি উচ্চারণ করে এবং কুফরি সংঘটন করে তবুও এসব বেতনভোগী, দুনিয়ালোভি 'আলিমরা শাসকের দাসত্ব থেকে নিবৃত্ত হবে না।"

পরিশিষ্টঃ

সবশেষে আমরা বলতে চাই, উম্মাহর কোন অংশকে কাফির বলে ঘোষণা করাকে আমরা আল্লাহ-র কাছে আশ্রয় চাই। একই সাথে দুনিয়ার লোভে, ভয় বা ভীতির বশবর্তী হয়ে কাফিরকে কাফির বলে চিহ্নিত করা থেকে বিরত থাকা, তাগুতের আনুগত্য এবং কুফরের বৈধতা দেয়া থেকেও আমরা আল্লাহ্ র কাছে আশ্রয় চাই। আমরা স্পষ্ট করে তাই বলি যা আল্লাহ্ বলেছেন – আল্লাহ্ -ই একমাত্র বিধানদাতা, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই। তিনি যা নাযিল করেছেন তা যারা শাসন করে না, আল্লাহ্ -র কসম ! আল্লাহ্ র ইজ্জতের কসম ! তারা কাফির। এমন শাসকের প্রতি কোন আনুগত্য থাকার প্রশ্নই আসে না। বর্তমান বিশ্বে মুসলিম ভূখণ্ড বলে স্বীকৃত কোন দেশের কোন শাসকই শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে না, এবং একারণে শার'ই ভাবে তাদের আনুগত্য করার পক্ষে কোন বিধান খুঁজে বের করা সম্ভব না। বরং এসব মুরতাদ-মুশরিক-কুফফার এবং তাওয়াগীতের পতন ঘটীয়ে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার উম্মাহ-র দায়িত্ব। একই সাথে আমরা এই বাস্তবতাও স্বীকার করি উম্মাহ-র সাধারনের মধ্যে এ ব্যাপারে সঠিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর অভাব আছে। একারণে এসব শাসকদের তাগুত, এবং এসব ভূখণ্ডকে দারুল কুফর বলে চিহ্নিত করা হলেও, আমরা সাধারণ মুসলিমদের কুফরী শাসন এবং তাগুতের অধীনস্ত হবার কারণে তাকফীর করি না। আমরা এরকম করা থেকে আল্লাহ্ র কাছে আশ্রয় চাই। মুসলিমদের রক্ত হালাল করার চেয়ে, নিজেদের রক্তের শেষ বিন্দুটুকুও প্রবাহিত করা সহস্রগুণ উত্তম। বরং আমরা বলি আমাদের দায়িত্ব হল তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ এবং উম্মাহর ফরয দায়িত্ব গুলো সম্পর্কে উম্মাহকে সচেতন করা, এবং যারা আল্লাহ-র দুনিয়াতে আল্লাহ-র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে কাজ করছেন তাদের ব্যাপারে উম্মাহকে সঠিক ধারণা দেওয়া, এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের জবাব দেওয়া এবং তাদের সৃষ্ট বিভ্রান্তির নিরসন করা যাতে করে সত্য সুস্পষ্টভাবে সকলের সামনে ফুটে উঠে। এব্যাপারে আমাদের অবস্থান, সাধারণ মুসলিমদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান এবং আহবান তুলে ধরার জন্য এবং সমাপনী বক্তব্য হিসেবে আমরা এখানে শাইখ আলি খুদাইর আল খুদাইরের একটি বক্তব্য তুলে ধরছি – আমরা আল্লাহ-র কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করেন, এবং এতে বরকত দান করেন। এবং সাফল্য শুধুমাত্র আল্লাহ্ র পক্ষ থেকেই।

শাইখ আলি খুদাইর আল খুদাইরঃ

যেসব শাসক আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসন করে, হোক তা মানবরচিত আইন কিংবা প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথা, তারা কুফফার-মুশরিকিন।

আল্লাহ্‌ বলেছেন-

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

"...তিনি নিজ হুকুমে/আইন প্রণয়নের [ফী হুকমিহি] কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না।" [আল-কাহফ, ২৬]

এবং আল্লাহ্‌ বলেছেন-

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

"হুকুম (বিধান) শুধুমাত্র আল্লাহর।" [আল আন'আম, ৫৭]

আর উলেমাদের ইজমা হল, তাদের (শাসকদের) এই কুফর হল কুফর আকবর (যা ব্যক্তিকে কাফিরে পরিণত করে), এবং ইবন কাসীর এবং তাঁর সমসাময়িক আহলুস সুন্নাহর অন্যান্য উলেমারা এই ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ্‌ বলেছেন-

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

"অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্যে গ্রহণ করো না,

যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই কাফির।” [আল-মায়’ইদা, ৪৪]

আল্লাহ্ বলেছেন-

ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به

“আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীপূর্ণ বিষয়কে (মীমাংসার জন্য) তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, (তাগুতকে) প্রত্যাখ্যান করার। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।” [আন-নিসা, ৬০]

আল্লাহ্ বলেছেন-

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

“তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?” [আশ শু’রা, ২১]

আর আজকের অবস্থা এরকমই। আমরা দেখি শাসকরা শাসন করছে মানব রচিত আইনের দ্বারা, যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা এসব আইনকে অন্য নাম দিচ্ছে। কিন্তু আমরা এসব নামের দিকে তাকাই না, বরং আমরা তাকাই এসব আইন-বিধানের বাস্তবতা ও অর্থের দিকে।

যদি কোন বিচারক কোন একটি ক্ষেত্রে শারীয়াহ ত্যাগ করে নিজের খেয়াল-খুশি অনুসারে (মানবরচিত সংবিধান, নিয়ম, ব্যবস্থা, প্রথা ও রীতিনীতি অনুসারে না) বিচার করে, সেক্ষেত্রে এ হল কুফর দুনা কুফর (এমন কুফর যা বড় কুফর বা কুফর আকবর না)

। কারণ হাদিসে আমরা দেখিঃ

“তিন প্রকারের বিচারক আছে । যাদের দুই প্রকার জাহান্নামে যাবে আর এর প্রকার যাবে জান্নাতে।

১। জান্নাতী সেই যে সত্য জানে এবং সত্যের দ্বারা বিচার করে।

২।এমন বিচারক যে তার মূর্খতা দিয়ে মানুষের মধ্যে বিচার করে সে জাহান্নামে যাবে।

৩।যে সত্য জানে কিন্তু সত্য থেকে বিমুখ, সেও জাহান্নামে যাবে।” [ইবন ওমার কতৃক রচিত “আল-হাকিম” সহ চারটি সুনান গ্রন্থে বর্ণিত]

“আল্লাহ্‌ র কাছে মাফ পাওয়ার জন্য এই শাসকদের ব্যাপারে কি করা আমাদের জন্য ওয়াজিব?” এ প্রশ্নের জবাবে শায়খ বলেন-

‘মানবরচিত আইন দ্বারা পরিচালিত তাগুতের আদালতে যাবেন না, এবং মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণ করুন। মিল্লাতু ইব্রাহীম হলঃ

إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده

তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। [আল মুমতাহানা, ৪]

আর আল্লাহর এই আয়াতে উপর ‘আমল করুনঃ

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين

অতএব আপনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না। [আল হিজর, ৯৪]

এবং আল্লাহ্‌ বলেছেনঃ

نيكرشملا نع ضرعأو وه لاإ هلإ لا كبر نم كيلإ يحوأ ام عبتا

আপনি পথ অনুসরণ করুন, যার আদেশ পালনকর্তার পক্ষ থেকে আসে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুশরিকদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। [আল-আন'আম, আয়াত ১০৬]

এবং আল্লাহ্‌ বলেছেন,

نودبعت ام دبعأ لا * نورفاكلا اهيأ اي لق

বলুন, হে কাফিরকূল, আমি ইবাদত করিনা, তোমরা যার ইবাদত কর। [আল-কাফিরুন, আয়াত ১-২]

এবং আপনাকে অবশ্যই এসব শাসকদের ঘৃণা করতে হবে এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে হবে, এবং তাদের প্রতি কোন বন্ধুত্ব বা আনুগত্যের মনোভাব পোষণ করা যাবে না।

আল্লাহ্‌ বলেছেনঃ

مهتريشع وأ مهناوخإ وأ مهءانبأ وأ مهءابآ اوناك ولو هلوسرو الله داح نم نوداوي رخلآا مويلاو اللهب نونمؤي اموق دجت لا

যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। [আল মুজাদিলা, আয়াত ২২]

এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে সাধ্যমত এবং তাদের ফিতনা প্রতিহত করতে হবে, এবং হিজরতের পর তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে।

يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم

হে নবী, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফিকদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হল দোযখ এবং তা হল নিকৃষ্ট ঠিকানা। [আত তাওবাহ, ৭৩]

আর যদি আপনি এগুলো করতে অসমর্থ হন, তবে আল্লাহর নির্দেশ আসার আগ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করুন, এবং এ সময়ে আপনি যদি অস্ত্রের জিহাদে অসমর্থ হন তবে অন্য কোন উপায়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে শামিল হোন।

فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي القرآن جهادا كبيرا

অতএব আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর (ক্বুর'আনের) সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম (দাওয়াহর মাধ্যমে) করুন। [আল ফুরক্বান, ৫২]"

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌ -র যিনি আল-'আফুয়্যু, আত-তাওয়্যাবু, আল-ওয়াহহাব, আশ-শাকুর - যিনি সমগ্র সৃষ্টির অধিপতি, সমস্ত কিছুর মালিক, মহিমান্বিত, গৌরবান্বিত, পরিপূর্ণ সম্মানের অধিকারী - যিনি সর্বশক্তিমান, প্রবল পরাক্রমশালী, অপ্রতিরোধ্য, প্রতাপান্বিত, সমুন্নত, আল-হাকাম, আল-হাকিম পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু – যিনি আল-আহাদ, আল-ওয়াহিদ, যিনি আল-'আলা, আল-'আলিয়্যু, যিনি সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ, যার কোন শরীক নেই, যিনি

ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন সাদৃশ্য নেই, কোন কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়, আমরা তাঁর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাবো এবং তাঁর ইচ্ছে ব্যাতীত কোন গতি, নিরাপত্তা, আশ্রয় নেই, নেই কোন শক্তি, সক্ষমতা কিংবা সামর্থ্য।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা আল নাবীউর মারহামা, আল নাবীউল মালহামা, আদ্ব-দ্বাহুক আল-ক্বাত্তাল, আল ইমামুল মুজাহিদীন, রাহমাতুললীল আলামীন মুহাম্মাদ এর উপর, তার পরিবার এবং তার সাহাবাদের উপর।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ব্যাতীত কোন ইলাহ নেই, তার কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, হুকুমাত তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান, তাঁর ইচ্ছা ব্যাতীত কোন শক্তি, সামর্থ্য, আশ্রয় নেই, এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর গোলাম এবং রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মহান আল্লাহ্ সত্য, তাঁর নাবী ﷺ সত্য, এবং তাঁর মনোনীত দ্বীন ইসলাম সত্য। নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, এবং জীবন ও মৃত্যু জগত সমূহের একমাত্র অধিপতি আল্লাহ্ 'আযযা ওয়া জালের জন্যই। আমিও আরও সাক্ষী দিচ্ছি, নিশ্চয় আল্লাহ্ হলেন সার্বভোম ক্ষমতার অধিকারী আর এ ব্যাপারে তাঁর কোন শরীক নেই, নিশ্চয় তিনি হলেন বিধানদাতা এবং তাঁর বিধান ছাড়া আর কোন বিধানের বৈধতা নেই, এবং নিশ্চয় দ্বীন ইসলাম একমাত্র সত্য জীবনবিধান, যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া আর কোন দ্বীন গ্রহণ করবে কোনদিনই তা তার পক্ষে থেকে কবুল করা হবে না। সে ক্ষতিগ্রস্থ দুনিয়াতে এবং আখিরাতে।

আপনাদের নেক দোয়ায় আমাদের ভূলবেননা